প্রভু জগদ্বন্ধু



ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমল বন্ধু দাস
প্রণীত

প্রধান প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত কার্য্যালয়
২৯ নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন,
(প্রবেশ পথ—কানাইধর লেন, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট)
কলিকাতা।
ফোন নং বি, বি, ১৯৭১

মাধুকরী ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম সম্প্রদায়

হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—১১০০

স্বচিকিৎসা প্রেস, ২৪।১ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১—৪ ফর্ম্মা এবং অবশিষ্টাংশ পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার পৃষ্ঠা

করকমলে

নিদর্শন স্বরূপ

এই পুস্তকখানি

উপহার

দিলাম

তাং ১৩

উৎসর্গ

উত্থান পতনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত দিক্‌ভ্রষ্ট জীবনে যিনি ধ্রুব-
লক্ষ্যের সন্ধান দিয়াছিলেন—প্রাক্তন-ভোগ-সংবেদনে
প্রার্থনা বলে যিনি কালের করালগ্রাস হইতে ছিনাইয়া
আনিয়া **কৃপাশক্তিসঞ্চারে প্রভুর লীলাগ্রন্থ**
রচনারূপ দুস্কর সাধনায় ব্রতী করিয়াছিলেন—
আজ সেই **সাধনার প্রথম অবদান**—
প্রাণারাম প্রভুর এই সেবার অযোগ্য
সামগ্রী—সেই আমার **পরম দয়াল**
দাদা শ্রীপাদ শিশুরাজ মহেন্দ্রজীর
পূতঃ কর-কমলে অর্পণ করিলাম।

২৮শে মাঘ শুক্লাত্রয়োদশী ১৩৪৭	প্রণতঃ চির অপরাধী **পরিমল**

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রেমাবতার প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরেব রহস্যময় দেব-জীবনের ঘটনাবলী সুসজ্জিত করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিয়া প্রতিনিয়তই নিজের অক্ষমতার কথা মনে উদয় হইয়াছে। আমি শাস্ত্রদর্শী-জ্ঞানী-পণ্ডিত নই—অধিকারী ভক্ত জনোচিত কোন গুণও আমার নাই। পবন্তু আমার ন্যায় নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটীপূর্ণ, পাপ-অপরাধজীর্ণ, দুর্ব্বল ব্যক্তি এরূপ বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে পদে পদে পদস্খলনই স্বাভাবিক। তাই উত্তম অধিকারী বান্ধব-সজ্জন-গণেব নিকট প্রথমেই করজোড়ে প্রার্থনা করি, তাহারা যেন দয়া করিয়া ভ্রম প্রমাদগুলি দেখাইয়া দেন, যাহাতে পরবর্ত্তী সংস্করণে সেইগুলি সংশোধন করিতে পারি।

এখন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগ্রহের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। প্রভু যাঁহার হস্তে চারি বৎসর বয়স হইতে লালিত পালিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠতাত অগ্রজাস্বরূপিণী দিগম্বরী দেবীর নিকট হইতেই পূর্ব্ব-পুরুষ পরিচয় ও বাল্যজীবনের সমুদয় বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। কিশোর জীবনের অধিকাংশ বিষয় উক্ত দেবীব মুখে এবং তদনুজ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অন্যান্য ঘটনাবলীর অধিকাংশই প্রাচীন ভক্ত বান্ধবদের নিকট হইতে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী স্বয়ং বা তদনুগত কোন কোন বান্ধব দ্বারা সংগ্রহ করাইয়াছেন এবং আমিও প্রাচীন ভক্ত বান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'বন্ধুকথা' ও 'জগদ্‌গুরু মহামহাপ্রভু জগদ্বন্ধু' গ্রন্থদ্বয় হইতেও কোন কোন বিষয় গৃহীত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, সর্ব্বপ্রকারের সংগৃহীত সমুদয় বিষয়ের শতাংশের একাংশও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংযোজিত করা সম্ভবপর হইল না। পাঠকগণ যদি 'শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত' গ্রন্থখানি প্রকাশের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হন, তবেই তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া প্রভুর লীলামৃত আস্বাদনের সুযোগ পাইবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি দেশবাসীর নিকট আবেদন প্রচার করিয়াছেন, যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়া গ্রন্থখানির বিষয় দেশবাসীব গোচরীভূত করিয়াছেন এবং যাঁহারা আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই।

অতঃপর মুদ্রিত গ্রন্থখানির ভাষা ও বিষয়-বস্তু-বিন্যাস সম্বন্ধে দেশ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে নানাপ্রকার নির্দ্দেশ পাইয়াছি। বান্ধববর শ্রীযুক্ত হরিহর দাদাজীবন এবং শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় আরও অনেক প্রকার সাহায্য করিয়া গ্রন্থ প্রকাশের পথকে সুগম করিয়াছেন। পরিশেষে নোয়াখালি অরুণ হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রুদ্র পাল মহোদয় অর্থাভাবে গ্রন্থের মুদ্রণে বিঘ্ন ঘটিতেছে, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র নিজের বহু অসুবিধা স্বীকার করিয়া এই দুর্দ্দিনে ১০০৲ একশত টাকা পাঠাইয়া যে মহাপ্রাণতা ও প্রকৃত বান্ধবতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বলিতে কি, তাঁহার এই প্রকার সহায়তা ব্যতীত গ্রন্থখানির প্রকাশে আরও অনেক বিলম্ব ঘটিত। শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট ইঁহাদের সকলেরই কল্যাণ কামনা করি। আশা করি, ভবিষ্যতেও ইঁহাদের সকলের স্নেহ-আশীর্ব্বাদ ও সাহায্য-সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গেল। এদেশে নির্ভুল করিয়া গ্রন্থ মুদ্রণ বড়ই দুরূহ ব্যাপার। বিশেষত নানাচিন্তায় বিব্রত থাকায় ঠিকমত প্রুফ দেখিতে পারি নাই। পরিশেষে যে শুদ্ধিপত্রটি দেওয়া হইল, পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে প্রধান প্রধান ভ্রমগুলি সংশোধন কবিয়া গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই প্রার্থনা। নিবেদন ইতি। ২৮শে মাঘ, ১৩৪৭।

বান্ধব-বৈষ্ণব-কৃপার্থী

ব্রহ্মচারী শ্রীপরিমল বন্ধু দাস

ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মহামানবের অভ্যুদয় হইয়াছে, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহার ভিতরে সত্য-সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সুনির্ম্মল আদর্শ এমনই অভিনবরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহা একান্ত দুর্ল্লভ।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বিজাতীয় ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে গ্লানিযুক্ত হয়, সেই অন্ধকারযুগে প্রভু জগদ্বন্ধু উজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকারূপে দেখা দিয়াছিলেন। সমগ্র জীবন ভরিয়া তিনি সত্যনিষ্ঠা-সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রেমের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে কোন্ পন্থা অবলম্বনে ভারতবর্ষ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে, তাহা স্বয়ং আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন।

নীরবে এবং নিভৃতে ছিল, তাঁহার সাধনা—মানবের কল্যাণ চিন্তাই ছিল, তাঁহার তপস্যা। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, হিন্দু সমাজের উন্নয়ন ও শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলনের বহু সহায়তা তিনি করিয়াছিলেন। ডোম, বুনা, বাগ্‌দী প্রভৃতি সমাজ উপেক্ষিত, ঘৃণিত, অস্পৃশ্যদের মধ্যে স্বয়ং তিনি বাস করিয়া তাহাদের

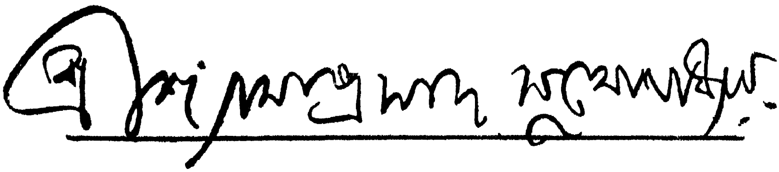
উন্নয়ন সাধন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের ভাব-লক্ষণগুলি তাঁহার মধ্যে প্রকট হইয়া উঠে। ক্রমশঃ তিনি নদীয়ার সেই গৌর-নিত্যানন্দের মত মানবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হরিনাম প্রচার আরম্ভ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুর সংহতি শক্তি উদ্বোধনের যে পন্থা অবলম্বন করেন, প্রভু জগদ্বন্ধু পরবর্ত্তীকালে তাহাকেই পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রভুর লোকোত্তর জীবনের সেই সমস্ত ইতিহাস অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

দেশ ও জাতির ভরসাস্থলই ছাত্র এবং তরুণেরা। তাঁহাদের চরিত্র সুগঠিত হওয়ার উপরই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে। প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবন হইতে ছাত্র ও তরুণদের অনেক জানিবার এবং শিখিবার বিষয় আছে। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, স্বজাতিপ্রেম, দীন-নারায়ণের সেবা, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি গুণগুলি ছাত্রেরা যদি আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে। এই দিক হইতে গ্রন্থখানি ছাত্র সমাজের নিকট আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য এই হিন্দুজাতি। যুগে যুগে এই জাতির মধ্যে উন্নতসত্ত্বা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা বিভিন্ন বিপর্য্যয়ের মধ্যে জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। জগতের প্রাচীন বহুজাতি কালের অতল গর্ভে লীন

হইয়া গিয়াছে কিন্তু হিন্দুজাতি এখনও যে মরে নাই—ইহা ঐ সব মহাপুরুষেব সাধনা ও তপস্যারই ফলে। হিন্দুজাতির বর্ত্তমান সঙ্কটকালে এইরূপ মহৎ জীবনেব অনুধ্যান জাতিকে নবীন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করুক্—ইহাই কামনা করি। ইতি।

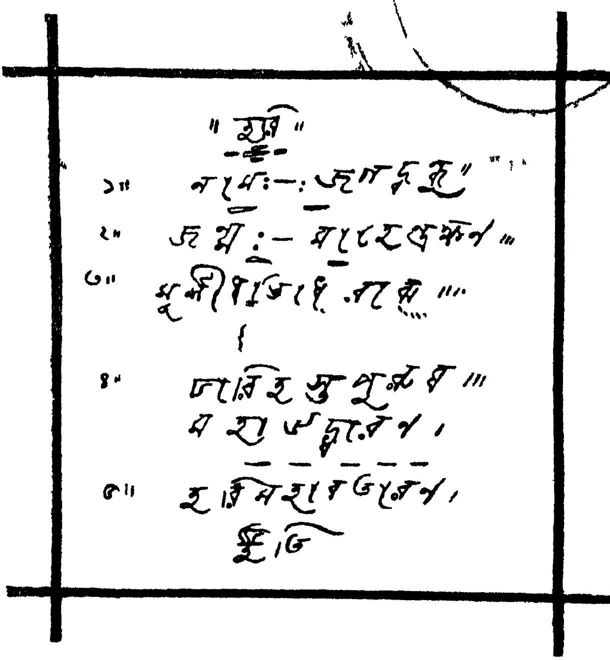
বিনীত—



কলিকাতা ১৯।২।৪১

সূচী

আত্মপরিচয়



এই আত্মপরিচয় শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শ্রীহস্তলিখিত। বাংলা ১৩০৭ সনের মাঘ মাসে ঢাকায় ত্রিপুলিন স্বামী নামক একজন যোগসিদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী প্রভুভক্ত বিদ্যার্থীসুহৃদ রমেশ শর্ম্মা মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের জগদ্বন্ধু কোন্ সম্প্রদায়েব সাধু? তাব পরিচয় কি?" এই প্রশ্ন শ্রবণে উক্ত ভক্তবব প্রভুকে স্বামিজীব কথা আনুপূর্ব্বিক জানাইলে শ্রীহস্তে উপরোক্ত আত্মপরিচয় লিখিয়া রমেশচন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বলেন "এই নেও আমার পরিচয়।" রমেশচন্দ্র উহা ত্রিপুলিন স্বামীকে দেখান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্লক করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচাব আরম্ভ করেন।

শুভ আবির্ভাব

১২৭৮ সালের (১৮৭১, মে) বৈশাখ মাসের ১৭ই তারিখ শনিবার পুষ্পবন্তযোগে, মাহেন্দ্রক্ষণে, সীতানবমী তিথিতে প্রভুর শুভ আবির্ভাব। আবির্ভাবস্থান—মুর্শিদাবাদ রাজধানী। প্রভুর লীলায় পিতার নাম দীননাথ ন্যায়রত্ন ও মায়ের নাম বামাদেবী। ন্যায়রত্নজী বঙ্গাধিকারী ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং স্বকীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠেও ব্যাকরণ, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যাপনা করিতেন। এতদ্দেশে ন্যায়রত্নের অসাধারণ প্রভাব ছিল। লোকে বলাবলি করিত, "ন্যায়রত্ন ইচ্ছা করলে জাত দিতেও পারেন আবার নিতেও পারেন।"

রাজলক্ষ্মীসুতা বামাদেবী সত্যিকার মা লক্ষ্মীরই অনুরূপা ছিলেন। শীতলদুহিতা তিনি—শীতলক্ষা স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাঁহার সুধামাখা স্নেহসম্ভাষণ ও সমপ্রাণে আপামর সকলের লালনপালন রসমধুরিমা শত ধারায় প্রবাহিত হইত। ভুব্রাহ্মণ শিরোমণি চৌধুরী-কুলোদ্ভবা তিনি—দেবী চৌধুরাণীর আদর্শও তাঁহার নিকট বিমলিন হইয়া পড়িত! ধ্যানধারণায়, পূজার্চ্চনায় অনেক সময় তিনি যেরূপ প্রেমাবিষ্টা থাকিতেন, তাহাতে কুলললনাগণ সহাস্যে রূপেগুণে সর্ব্বাংশে গরীয়সী বলিয়া ভুয়সী প্রশংসা করিতেন। ন্যায়রত্ন ও তিনি সদাসর্ব্বদা বাৎসল্যভাবেই বিভোর থাকিতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের নিয়মিত নিত সেবা-পূজা ও ভক্তিভাগবত চর্চ্চাতেও ব্রতী ছিলেন।

প্রভুর আবির্ভাবভূমি মুর্শিদাবাদ প্রকৃতির বিচিত্র লীলাদৃশ্যে পরিপূর্ণ। এককালে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। এখানে আসিলে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে পাশাপাশি দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ডাহাপাড়া ঢাকাবাসীদের উপনিবেশরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকাপাড়া হইতেই ডাহাপাড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের প্যালেসের ঠিক পরপারেই ডাহাপাড়া অবস্থিত।

ডাহাপাড়ার অর্দ্ধক্রোশমাত্র পশ্চিমে দেবী কিরীটেশ্বরীর মন্দির। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহরক্ষা করিবার পর তাঁহার একান্নটি অঙ্গঅংশে ভারতে একান্নটা পীঠস্থানের উদ্ভব হইয়াছে। এইস্থান তাহারই অন্যতম। ডাহাপাড়া প্রান্তবাহিনী গঙ্গার অপর পারে সুপ্রসিদ্ধ কাট্‌রার মস্‌জিদে অনেক ফকির দরবেশ বাস করিতেন। রোশনীবাগ, ফর্হাবাগ প্রভৃতি নবাবদের প্রমোদ কাননগুলি এখানে নিরতিশয় শোভা-সৌন্দর্য্যের আকর। এখানকার হিরাঝিল, মতিঝিল প্রভৃতি নবাবদের বিলাস-কক্ষের নাম জগদ্‌বিখ্যাত।

ডাহাপাড়ার অনতিদূরেই পলাসীর প্রান্তর এবং সেই পূতঃ-সলিলা ভাগীরথী। এখানেই ভারতের স্বাধীনতার শেষসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের দুঃখ দুর্গতির সূত্রপাতও হইয়াছে এইখান হইতেই। ভোগবিলাসেরও ইহা উৎকট অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ। এখানে আসিলে জাতীয় জীবনের উত্থান পতনের রহস্যচিন্তায় মনকে স্বতঃই তোলপাড় করিয়া তুলে।

পূর্ব্বপুরুষ পরিচয়

নদীয়াজীবন শ্রীমন্ গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীহট্ট গমনের পথে পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মার তীরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, একথা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ঐ সময়ে প্রাচীন গোয়ালন্দ সন্নিহিত পদ্মাতীরবর্ত্তী কোমরপুর নামক গ্রামটী সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। অনেক বেদবিদ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ সজ্জন সেখানে বসবাস করিতেন। উহাদের মধ্যে বাসুদেব চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধিতে অদ্বিতীয় ও ভক্তিনিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। ইনি সামবেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্গত কাশ্যপগোত্রসম্ভূত। উক্ত বাসুদেব মঙ্গল ওঝার বংশধর! ঐ বংশ ক্রমে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে আমহাটির রায়, নারিটির ভট্টাচার্য্য ও বেথুরের চক্রবর্ত্তীকুল প্রধান। বাসুদেব ছিলেন বেথুরের চক্রবর্ত্তী বংশসম্ভূত। মঙ্গল ওঝা, ময়ূর ভট্ট, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি সমাজ নেতাগণ সমসাময়িক। বঙ্গীয় স্বাধীন হিন্দু নরপতি গণেশের ইঁহারা সভাপণ্ডিত পদে সমলঙ্কৃত ছিলেন। বঙ্গীয় ৭৭৫ সাল রাজা গণেশের অভ্যুদয়কাল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া উক্ত বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বাসুদেবের উত্তর-পুরুষ রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নাম কৃষ্ণমঙ্গল ও কৃষ্ণকমল। কৃষ্ণমঙ্গলের সময়েই কোমরপুরের বাড়ী

পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এই বাড়ীতে বংশানুক্রমিক দুর্গোৎসব হইত। ভগবতী দুর্গার প্রতিমাখানি যখন দোমেটে মাত্র হইয়াছে, তখনই কৃষ্ণমঙ্গলের উক্তপ্রকার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। তিনি কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ, দোমেটে দুর্গাপ্রতিমা ও অন্যান্য আসবাব সহ নৌকাযোগে পদ্মাতীরস্থ গোবিন্দপুর নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হন।

মক্তারাম সরকার গোবিন্দপুরের একজন ধনাঢ্য ও বদান্য জমিদার ছিলেন। তিনিই কৃষ্ণমঙ্গলকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজব্যয়ে তাঁহাদের জন্য সুরম্য একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং স্বচ্ছলরূপে যাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই পরিমাণ যথেষ্ট জমি ব্রহ্মোত্তরসূত্রে দান করেন। কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্রের নাম ছিল শম্ভুনাথ। তাঁহার চারিপুত্র হবানন্দ, বাণীকণ্ঠ, ভৈরব ও দীননাথ এবং দুইটি কন্যা হরসুন্দরী ও কাশীশ্বরী। হবানন্দ ও বাণীকণ্ঠ অল্পবয়সেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণমঙ্গলের কনিষ্ঠ কৃষ্ণকমল আরাধন নামক পুত্ররত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন। আরাধন বিবাহিত হইলেও সংসারে বীতরাগ ছিলেন। একদিন তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহ হইতে বহির্গত হন ও কিছুদিন পরে নাটোর রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। রানীভবানীর দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ তখন নাটোরের অধিপতি—শাক্তসাধককুলের তিনি অন্যতম ছিলেন। পরম গুণগ্রাহী রাজা রামকৃষ্ণ আরাধনের অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইলেন এবং সসম্মানে রাজআতিথ্যে তাঁহাকে

সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিলেন। রাজকুমার বিশ্বনাথের প্রাথমিক শিক্ষার ভারও তাঁহার উপরই অর্পিত হইল। বিশ্বনাথ যে পরবর্ত্তী জীবনে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা বৈষ্ণবকুলমণি আরাধনের সংসর্গেরই ফল।

এদিকে আরাধনের আত্মীয় স্বজন বহু অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁহার সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং অনুনয়-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিলেন। দ্বিজবর শম্ভুনাথ তখন আর যাহাতে স্নেহের ভাইটি সংসারত্যাগী না হয়, তজ্জন্য স্বীয় তৃতীয় পুত্র দীননাথকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তিনিও উক্ত বালকের অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া তাহাকে ন্যায়দর্শন, স্মৃতি ও ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতে থাকেন।

আরাধনই শিষ্যপ্রতিম ভ্রাতৃষ্পুত্র দীননাথ এবং কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ লইয়া মুর্শিদাবাদ গঙ্গাতীরে যাইয়া আশ্রম স্থাপন করেন। সেখানেও তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। মুর্শিদাবাদ বিদ্বৎসমাজ হইতে দীননাথ ন্যায়রত্ন উপাধি লাভ করেন। মুর্শিদাবাদেই আরাধন পণ্ডিতের মহানির্য্যাণ ঘটে। তৎপর দীননাথ গোবিন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন। গোবিন্দপুরে তিনি দ্বাদশ বৎসরকাল ঋষিযুগের নিয়মানুসারে একটি বিদ্যামন্দির পরিচালনা করেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে কয়েকমাসকাল তিনি ফরিদপুর জিলা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথাকার হেড পণ্ডিতের পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপুরেই ১২৬৯ সালে দীননাথ গুরুচরণ নামক এক পুত্র লাভ করেন। ঐ সন্তানটি আটমাস মাত্র ধরাধামে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর ১২৭২ সালে কৈলাসকামিনী নাম্নী একটি কন্যারত্ন লাভ করায় তাঁহাদের পুত্রশোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। ১২৭৫ সালের বর্ষাকালে কন্যা ও সহধর্ম্মিণীসহ ন্যায়রত্ন ডাহা-পাড়া গমন করেন এবং সেখানকার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত রাধা-গোবিন্দের কুঞ্জ পুনঃ সংস্কৃত করিয়া শ্রীবিগ্রহযুগলের সেবা পরিচর্য্যা ও অধ্যাপনা কার্য্যে লিপ্ত হন।

ডাহাপাড়ায় প্রভু
(শৈশবে)

প্রভুর তিনমাস বয়সের সময় নেপাল হইতে একজন সন্ন্যাসী জ্যোতির্ব্বিদ রাণী স্বর্ণময়ীর ভবনে আসেন। আয়ুর্ব্বেদের সংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ তখন ডাহাপাড়ায় বাস করিতেন। তিনি ন্যায়রত্নের অন্তরঙ্গ বান্ধবরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। একদিন গঙ্গাধর বন্ধুবরকে উক্ত জ্যোতিষীর আগমন সংবাদ দান করিয়া শিশুকে একবার তাহার নিকট লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন। দীননাথ তদনুসারে স্বরক্ষিত ঠিকুজীসহ তথায় গমন করেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ উক্ত ঠিকুজীতে অত্যাশ্চর্য্য লক্ষণ সকল দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ন্যায়রত্নকে আর

একদিন আসিতে বলিলেন। দ্বিতীয়দিনও দেখা শেষ হয় নাই বলিয়া পণ্ডিতজীকে ফিরাইয়া দিলেন। তৃতীয় দিন পুনরায় ঠিকুজীর ফল জানিতে গেলে জ্যোতিষী বলিয়া উঠিলেন "তোমার ছেলে বেঁচে আছে তো?" প্রশ্ন শুনিয়া দীননাথ অশুভ ফল আশঙ্কায় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসীপ্রবর সান্তনাব ছলে বলিতে লাগিলেন "না না! কোন চিন্তা কবো না। তোমার ছেলে কি করছে, তাই জানতে চাই!" ন্যায়রত্ন তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "খোকাকে খেলা করতে দেখে এসেছি।" জ্যোতিষী কহিলেন "তোমার ছেলেটিকে আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে। তাঁকে একবাব আমার কাছে নিয়ে আস্‌তে পার?" ন্যায়রত্ন সম্মতি জানাইয়া চতুর্থ দিবস প্রাণপুত্রকে লইয়া আসিলেন। যতিবর সেই অনিন্দ্যসুন্দর-কান্তিশ্রী, সুচারু মুখারবিন্দ, চাঁচরচিকুর কেশগুচ্ছ, আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাশ আখিদ্বয়, তিলফুলনিন্দিত নাসিকা, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, রক্তোৎপল সদৃশ করতল, ক্ষীণকটা এবং নিটোলসুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রভুর রাঙ্গা পাদপদ্ম দুখানি শিরোপরি ধাবণ কবিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, "পণ্ডিতজী! আমার বাংলায় আগমন সার্থক হইল। তুমি মহাভাগ্যবান! যে পাঁচটি গ্রহসংযোগে অবতারের জন্ম হয়, এই শিশুর জন্মলগ্নে সেই পাঁচটি গ্রহই তুঙ্গস্থ। এই ছেলে কালে মহাপুরুষ হইবেন। ইহার দ্বারা সমস্ত জীব কৃতার্থ হইবে।"

এই ঘটনার পর সহসা উক্ত জ্যোতিষী নয়নান্তরাল হইয়া যান। রাণী স্বর্ণময়ী বহু খোঁজ করাইয়াও বিফলমনোরথ হন। ওদিকে তিনি ছদ্মবেশে ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গে কিরীটেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গনে দেখা দেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হন। মায়ের পূজারী তখন মন্দিরে পাগল ঢুকিয়াছে বলিয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বহু লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। অবধূতবেশীকে কেহই সেই জ্যোতিষী বলিয়া চিনিতে পারিল না এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে বিষম প্রহার আরম্ভ করিল। কি আশ্চর্য্য! ভক্ত বাৎসল্যময়ী মা ভগবতীর অঙ্গে উক্ত প্রহারের দাগ রক্তাভ হইয়া ফুটিয়া উঠিল! উহা দেখিয়া প্রহারকারিগণ নিজদিগকে মহাঅপরাধীজ্ঞানে উঁহার চরণে লুটাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। অবধূতবর তখন অনর্গল বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু উপস্থিত কেহ উহার মর্ম্মার্থ না বুঝিতে পারায় সংবাদ দিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি আসিয়াই তাঁহাকে জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মহাসমাদরে স্বীয় কুঞ্জকুটীরে লইয়া আসিলেন। এই সন্ন্যাসী কিছুদিন ডাহাপাড়াতে বাস করেন এবং প্রাণ ভরিয়া প্রভুর দর্শনস্পর্শনে কৃতার্থ হন। ইনিই শিশুর নাম "জগদ্বন্ধু" রাখিবার আদেশ দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠমাসে ডাহাপাড়াতেই প্রভুর অন্নপ্রাসন ও উক্তরূপ 'জগদ্বন্ধু' নামকরণ হইল। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ আদর করিয়া 'জগৎ' বলিয়া ডাকিতেন।

গোবিন্দপুরে প্রভু

(বাল্যে)

ডাহাপাড়ায় একবৎসর দুইমাস বয়সে প্রভুর মাতৃবিয়োগ ঘটে। বামাদেবী হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর অগ্রদূতস্বরূপিণী ছিলেন। তিনি অনুগত মুসলমান প্রতিবেশীদের আদরের ধন জগতকে তাহাদের অনুরোধ ও অনুকরণে মধ্যে মধ্যে গণিলাল বলিয়া ডাকিতেন। মাতৃহারা হইবার পর উর্ম্মিলা নাম্নী ঝি ও কৈলাসকামিনী প্রভুকে লালনপালন করিতে থাকেন। ভট্টাচার্য্য বাড়ীর ন'মাও মাঝে মাঝে প্রভুর তত্বাবধান করিতেন। দীননাথ, অগ্রজ ভৈরবের নিকট সহধর্ম্মিণীর লোকান্তর সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি নৌকাযোগে প্রভুকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসেন। ভৈরবগৃহিণী দেবী রাসমণির উপর তখন প্রভুর লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। রাসমণিকেই প্রভু মাতৃ সম্বোধন করিতেন। প্রভুর অগ্রজাস্বরূপিনী কৈলাস-কামিনী ডাহাপাড়া হইতে আসিবার আটমাস পরে স্বর্গারোহণ করিলে জেঠাইমাতা রাসমণি দেবী প্রভুকে বাৎসল্য-ভরে প্রতিপালন করেন এবং তিন বৎসর পরে তিনিও দেহরক্ষা করেন।

রাসমণির দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া দীননাথ গোবিন্দপুরে আগমন করিয়াছিলেন। বালবিধবা দিগম্বরী দেবী ভৈরবের

কন্যা ছিলেন। তাঁহার হস্তে তিনি প্রভুকে অর্পণ করিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি যদি বাঁচাতে পার।"

কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু 'হয়ি হয়ি' উচ্চারণ করিতেন। শৈশবসঙ্গী প্রতাপভূঞা ও আর আর বালকদের সঙ্গে প্রভু হরিনামের খেলারসে মাতিয়া থাকিতেন। প্রতাপকে দেখিলেই 'পের্‌তাপ্‌ কর্‌তাল্‌' বলিয়া কীর্ত্তন কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত জানাইতেন। "দগামাধা পাপী ছিয়। হয়িনামে তয়ে গেয়॥" এই পংক্তিদ্বয় প্রায়ই প্রভুর স্বীণা বিনিন্দিত শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হইত। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রভু গাহিতেন—"সংসার বাসনা মোর কিছু মনে নাই। আমায় ডোর কৌপীন দাও ভারতী গোঁসাই॥"

পাড়া পড়সী কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই প্রভুকে কোলে বুকে করিয়া আদর করিতেন। প্রভুর অপরূপ রূপ-লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দূর-দূরান্তর হইতেও দলে দলে লোক প্রভুর দর্শনের আশায় চক্রবর্ত্তী ভবনে ছুটিয়া আসিত। তিন বৎসর বয়সেই প্রভুর বাল্য-চাপল্য আরম্ভ হয়। বাড়ীর উপরে বড় বড় খড়ের ঘর ছিল। কখনও প্রভু সকলের অগোচরে মই বাহিয়া চালের মট্‌কার উপর যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। দিগম্বরী দেবী উহা দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে পাড়ার লোক ডাকিয়া জড় করিতেন। অতি সন্তর্পণে তখন প্রভুকে নামাইয়া আনা হইত।

বাড়ীর অদূরবর্ত্তী ছিল পদ্মার ঘাট। কখনও বা ঘাটে গিয়া নৌকারোহণে প্রভু স্রোতমুখে উহা ভাসাইয়া দিতেন। এইরূপ

অসম সাহসের নানাকাজে প্রভু সকলেব বিস্ময় উৎপাদন কবিতেন। কখনও পদ্মায় নামিয়া আপন মনে জলক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। দিগম্বরী দেবী কুমীরের ভয় দেখাইয়া ধবিয়া আনিতে গেলে ক্ষণে জল, ক্ষণে বালি ছিটাইয়া তাঁহাকে নিবস্ত কবিবাব চেষ্টা পাইতেন।

কখনও বা পদ্মার তীর ধরিয়া পদব্রজে চলিয়া যাইতেন। ভৈরবাদি প্রভুকে ধরিয়া আনিতে গিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, "কোথায় যাচ্ছিলে জগৎ?" প্রভু তখন মৃদু-মধুরস্বরে উত্তর করিতেন "যাত্তাম্ ঈছান্ দাছের বায়ী আর না হয় মকিম কোন্দানের বায়ী।" রায়সাহেব ঈশানবাবু তৎকালে গোপালপুরের স্বনামধন্য দানশীল জমিদার ছিলেন আর মকিম কোন্দান বা মকিম বরকন্দাজ—ইনি ছিলেন ভৈরব চক্রবর্ত্তীর একজন প্রজা। ইনি প্রভুকে অত্যধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। দ্বিজবব দীননাথও এই কয়বৎসর প্রভুকে লইয়া বাৎসল্যের খেলা খেলেন। চারবৎসর বয়সেই হাতে খড়ি দিয়া প্রভুর বিদ্যারম্ভ করান হয়। পিতৃদেব দীননাথই প্রাথমিক শিক্ষকপদে বৃত হন; পরে তিনি গ্রামস্থ দুর্গাচরণ দাসের পাঠশালায় প্রভুকে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়া ডাহাপাড়া হইতে বিদ্যার্থীদের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে সেখানে চলিয়া যান।

শিক্ষক মহাশয় প্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। প্রভুর স্মৃতি, মেধা, প্রতিভা ও হাব-ভাব সমস্তই অসাধারণ দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতেন "আমি তো জীবনে অনেক ছেলেই পড়াইয়াছি কিন্তু এমন অদ্ভূত ছেলে তো কখনও দেখি নাই।

একে আর কি পড়াব? মনে হয়, এ যেন সবই জানে—সবই বোঝে।”

১২৮২ সনের বৈশাখে প্রভুর বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল আর ঐ সনের শ্রাবণেই গোবিন্দপুরের প্রথম বাড়ী পদ্মায় ভাঙ্গিল। ঐ সময় কিছুদিন সকলে রাজলক্ষ্মীজনক দ্বারিকানাথ ভবনে অবস্থান করিয়া মাঘ মাসে জ্ঞানদিয়া গ্রামে এক মুসলমান প্রজার জায়গায় নূতন বাড়ীতে আগমন করিলেন।

গোবিন্দপুরে ধাইমারূপেঁ ছিলেন কায়স্থ ভোজবংশীয়া একটি প্রৌঢ়া বিধবা। তাঁহার নাম ছিল আনন্দের মা। স্বামী-পুত্রহারা অভাগিনী অবস্থায় চক্রবর্ত্তী পরিবারে তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ভৈরবাদি তাঁহাকে মাতৃসমা মান্য করিতেন। শম্ভুনাথগৃহিণী দ্রৌপদীদেবীর দেহরক্ষার পরে তিনিই একপ্রকার গৃহকর্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার উপরে রাধা-গোবিন্দের পূজার উপচার সংগ্রহের ভার ছিল। তিনি প্রভুর স্নানাদি পরিচর্চ্চা করিতেন। স্নান করাইবার পূর্ব্বে তৈলমর্দ্দনের সময় পায়ে তৈল দিতে গেলে প্রভু পা সরাইয়া লইতেন। উহাতে আনন্দের মা বলিতেন, “কালে এই পায়ে কতজন নমঃ কর্‌বে!”

প্রভুকে কোলে করিয়া গল্প না বলিলে খাওয়ান যাইত না। আট নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই অভ্যাসটী বলবৎ ছিল। দিগম্বরী দেবী প্রভুকে আহার করাইবার সময় প্রত্যহ নানা-প্রকার শাস্ত্র আখ্যান ও সদুপদেশপূর্ণ রূপকথা শুনাইতেন। বালকসুলভ চপলতার মাঝেও প্রভুর অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান

ছিল। গুরুবর্গের প্রতি কখনও তিনি অসম্মানসূচক ব্যবহার করিতেন না। কাহারও সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বিবাদও করিতেন না। সকলেরই তিনি আদরের ধন ছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে অভিনব সারল্য প্রকাশ পাইত। মিথ্যাকপটতার ধারেও তিনি যাইতেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর মধুর রূপেও জোয়ার দেখা দিল। প্রভুর চাঁদপানা মুখখানিতে সদাসর্ব্বদা মন্দ মধুর হাস্যরস উৎসারিত হইত। ব্রহ্মচর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা, অহিংসা ও তপশ্চর্য্যার জলন্ত বিগ্রহরূপেই তিনি দিন দিন প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ আচার নিষ্ঠাই তিনি প্রতিপালনে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রভুকে দেখিলে এই শাস্ত্র বাক্যটী স্বতঃই স্মরণ-পটে উদিত হইত ঃ—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

হিন্দুধর্ম্মের সারাংশস্বরূপ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাল্যকাল হইতেই প্রভুর তাহাতে প্রবল অনুরাগ দেখা যাইত। নিতাই গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণের লীলারূপগুণগাথা লইয়াই তিনি বিভোর থাকিতেন। উপনয়নের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রভু পদ্মাসনরঙ্গে দয়রামপুরের বাত্তরে স্বর্ণকমলটীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেন। কখনও বা নিকটস্থ শশ্মানে শাল্মলীমূলে আপন-মনে বসিয়া থাকিতেন। প্রবর্ত্তক-সাধক-সিদ্ধ এই সব ক্রমপর্য্যায় প্রভুকে কেহ অবলম্বন করিতে দেখেন নাই। নিত্যসিদ্ধ মহাযোগেশ্বরস্বরূপেই তিনি সতত প্রতিভাত হইতেন। প্রভুকে দেখিলে মনে হইত,—তাঁহার যতকিছু লীলাবৈচিত্র্য সবই

জীবশিক্ষার জন্য। বর্ত্তমান হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরীভূত ঘোর প্রলয়কালে প্রেমধর্ম্মই যে একমাত্র শরণীয়, ইহাই প্রভু আবাল্য ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন।

ঐ সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় ডাহাপাড়াতেই থাকিতেন। তিনি সুন্দর পুরাণ পাঠ করিতেন। ১২৮৪ সালের মাঘমাসব্যাপী ভট্টাচার্য্য গৃহপ্রাঙ্গণে তিনি ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পরই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। কিছুকাল হইতেই প্রভুর জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সততই এই চিন্তা প্রকাশ করিতেন "আর বুঝি ঐ চাঁদমুখ দেখা ভাগ্যে হবে না।" তাই ১২৮৫ সালের বৈশাখ মাসে যখন তিনি প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন অহোরাত্র কেবল "হায়, হায়, হায়, হায়" এই শব্দটি উচ্চারণ করিতেন।

উক্ত ব্যাধিই তাঁহার তিরোভাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। ডাহাপাড়ায় যেদিন ঐ ভীষণ অনর্থপাত হইয়া গেল, সেদিন গোবিন্দপুরে প্রভু সারানিশি কাঁদিয়া কাটাইলেন। শতপ্রশ্নেও ক্রন্দনের কারণ ব্যক্ত করিলেন না। পরদিনই তারযোগে দীননাথের দেহত্যাগের সংবাদ গোবিন্দপুরে আসিয়া পৌঁছিল। লক্ষ্মণের শোকে রামচন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধ ভৈরব চক্রবর্ত্তী ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া "আরে আমার লক্ষ্মণ ভাইরে" বলিয়া আকুলস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবী দিগম্বরী ও পরিবারস্থ অন্যান্য

সকলেরও পরিতাপের সীমা রহিল না। প্রভু যে স্বকীয় অন্তর্য্যামিত্ব বলে এই শোকসংবাদই গত রাত্রে অবগত হইয়াছিলেন, ইহাও সকলে বুঝিতে পারিলেন। প্রভু সেদিন সকলের কান্নাকাটি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এতবড় মানুষও কোনখানে মরে না আর এত কান্নাকাটিও কেউ করে না।" শিশুর মুখে এই গম্ভীর ভাষা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

পিতৃবিয়োগেব চিহ্নস্বরূপ যথারীতি উত্তরীয় প্রভৃতি ধারণ করিয়া প্রভু হবিষ্যান্ন গ্রহণ কবিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধের দিবস বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিলেন। চারপাঁচ ঘণ্টাকাল একাসনে বসিয়া শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়াও কোনরূপ ক্লান্তিবোধ করিলেন না।

পিতৃবিয়োগের তিনমাস পরে শ্রাবণমাসে উক্ত দ্বিতীয় বাড়িটিও পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল। ভৈরবঠাকুর সাত-মাসকাল সপরিবারে জ্ঞানদিয়ার রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীভবনে অবস্থান করিলেন। পরে ফবিদপুর সহরতলী ব্রাহ্মণকান্দায় নূতনবাড়ী নির্ম্মিত হইলে সকলের সঙ্গে সেখানে আগমন করিলেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভু

(পৌগণ্ডে)

১২৮৫ সালেব মাঘমাসে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে প্রভুর শুভ পদার্পণ ঘটে। শ্রীপাদ ভৈরব কিছুদিন বাড়ীতেই ঈশ্বর মাষ্টারের পাঠশালায় প্রভুর পড়াশুনার বন্দোবস্ত করেন। পরে তাঁহাকে ফরিদপুর বাংলাস্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় হয় এবং বর্ত্তমানে ফরিদপুর হাইস্কুলে পরিণত হইয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, স্বনামধন্য ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই স্কুলেই প্রাথমিক বিদ্যালাভ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে আসার কয়েকমাস পরে ভৈরবচন্দ্র কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কবিরাজ রাইচরণ সেনের চিকিৎসাধীনে থাকায় কিছু সুস্থ হইলেও শরীর যে তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহা আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল না। রোগ-জীর্ণ অবস্থাতেই বৎসরাধিক অতিবাহিত হইল। ১২৮৬ সনের দুর্গোৎসবের মধ্যেই তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইলেন। দ্বাদশীর দিন সজ্ঞানে হরিনাম জপ করিতে করিতে তাঁহার পরাৎপর ধামে যাত্রা ঘটিল।

সংসারের যাবতীয় ভার যাঁহার উপরে ন্যস্ত ছিল, তাঁহার অভাবে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভৈরবের জ্যেষ্ঠপুত্র। অনুজ তারিণীচরণ সহ

তিনিই সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিলেন। প্রভুর বাল্য-চাপল্য ব্রাহ্মণকান্দাতেও বিদ্যমান ছিল কিন্তু জেঠামহাশয়ের পরলোকগমনের দিন হইতেই তাঁহার স্বভাবে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিল। অতঃপর সদা সর্ব্বদা প্রভুকে কি যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে দেখা যাইত। তৎকালীন প্রভুর ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি দেখিলে সকলেরই মনে তৎপ্রতি ভক্তিভাবের উদ্রেক হইত।

এদিকে বাংলাস্কুল হইতে প্রভুকে ফরিদপুর জিলাস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হইল। যখন তিনি এই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলেন, তখন মাত্র ত্রয়োদশ বৎসরের বালক। এই সময়েই প্রভু সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১২৯১ সালের বৈশাখমাসে উপনয়ন সংস্কারের পর হইতে আদর্শ ব্রাহ্মণকুমারের মত তিনি যথারীতি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। অন্যমনস্ক উদাসীন ভাবও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন প্রভু পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিতেন। ক্রমে এমন হইল, পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেন। দেবী দিগম্বরী প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। তারিণী, গোপালাদি বিস্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। কোনদিন বা বনঝোপের আড়ালে, কোনদিন বা শূন্য ভিটায় প্রভুকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় উপবিষ্ট দেখা যাইত। কোনদিন বা বহু অনুসন্ধানেও না পাইয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। ওদিকে প্রভুও এক বন হইতে সহসা সকলের সম্মুখীন হইতেন। রাত্রে

প্রভু দিগম্বরী দেবীর অঙ্কপাশে শয়ন করিতেন। গভীর নিশীথে সকলে নিদ্রাতুর হইলে একাকী বাহির হইয়া নিশাচরের মত পথে ঘাটে ও বনে জঙ্গলে বিচরণ করিতেন। কোনরকমের ভয়ভীতি তাঁহাতে আদৌ পরিলক্ষিত হইত না।

বাল্যকাল হইতেই প্রভুর প্রত্যেকটী কার্য্য, বাক্য, হাবভাব, চালচলন ও আচার ব্যবহারাদিতে অলৌকিকত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। বনে বনে ঘুরিয়া পরমপাবনস্বভাবে তিনি জীবের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। কখনও কখনও অশ্রুতে প্রভুকে বুক ভাসাইতে দেখা যাইত। শত জিজ্ঞাসাতেও ক্রন্দনের কারণ কি, তাহা প্রকাশ করিতেন না। কথা খুব কম বলিতেন। বহু প্রশ্নের পর কদাচিৎ দুই একটী উত্তর দিতেন। কণ্ঠস্বর প্রভুর এতই মিষ্ট ছিল যেন কাণের ভিতর দিয়া উহা মরমে পশিত।

অধিকাংশ সময়েই প্রভু নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। স্কুলেও সহপাঠীদের সঙ্গে বাজে আলাপ আলোচনা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলিতেন না। কাহারও সাথে অবৈধভাবে মেলামেশার প্রচেষ্টাও তাঁহাতে আদৌ পরিদৃষ্ট হইত না। "কৈতব দেখিয়া সখ্যে ভয় হয়। অকৈতবে সখ্য করিও" ইহাই প্রভুর ছাত্রসমাজের প্রতি উপদেশ ছিল। ছুটির পর মাঝে মাঝে প্রভু জলধর ও দুঃখীরাম ঘোষের দোকানে আসিয়া বসিতেন এবং তাঁহাদের আদরের দেওয়া ছানা, মাখন, ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতি গ্রহণ করিতেন। দুঃখীরাম প্রভুর পরশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবে উন্নীত পরম ভক্তরূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

এদিকে প্রভুর মানসিক অবস্থার উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। দিদিমণির সহিত এক বিছানায় শয়ন তিনি পরিত্যাগ করিলেন। শেষরাত্রে কোনওদিন প্রভু বিছানায় থাকিতেন না। সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া প্রায়শঃ বলিতেন "শেষ-রাত্রে নিদ্রা মৃত্যুতুল্য।" নিশাশেষে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক প্রভু নিকটস্থ যশোর রোডের উপর দিয়া বিচরণ করিতেন। কোন কোন দিন এতদূরে চলিয়া যাইতেন যে ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইয়া যাইত।

এই সময় হইতেই প্রভু সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। কাছাটি এত লম্বা করিয়া দিতেন যে মাটী দিয়া লুটাইয়া যাইত। প্রভুর দেহখানি অনন্যসাধারণ দীর্ঘাকৃতি ও অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যের আকর ছিল। একবার যে দেখিত, সেই আর ভুলিতে পারিত না। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীবেশী প্রভুর পবিত্র আদর্শে মুগ্ধ হইয়া তৎকালীন বহুছাত্র নিরামিষভোজী, শুদ্ধাচারী, ত্রিসন্ধ্যা স্নানতৎপর ও হরিনামে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য ছাত্রদের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক সময় "জগদ্বন্ধু আমাদের ছেলেগুলির মাথা খেল" বলিয়া তাহাদিগকে খুব উৎপীড়ন করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভু আর যাহাতে ওদের সঙ্গে মিশিতে না পারে, সেবিষয়ে অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষক ভুবনবাবুর নিকট প্রায়শঃ আবেদন জানাইতেন এবং যাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুকে শাসন করেন, এই ভাব পোষণ করিতেন। কিন্তু অজাতশত্রু প্রভুর সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে উক্ত ভুবনবাবুর ভীমবেত্র উত্তোলন করা দূরের কথা, ঐ মোহন

ছবিখানি দেখিলেই বাৎসল্যরসে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া পড়িত। প্রভুর ভিতরে যে অসাধারণত্ব আছে, তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতেন।

১২৯৩ সালে প্রভু অষ্টম শ্রেণীর (তৎকালীন 3rd. Class) বাৎসরিক পরীক্ষা দিতেছেন। কোনদিকে নীরব নিস্পন্দ-ভাবে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকান প্রভুর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ইতিহাস পরীক্ষার দিনও প্রায় অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া টেবিলের উপর খাতাটি রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে আন্‌মনা ভাবে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে পার্শ্ববর্ত্তী একটি সহপাঠী প্রভুর লিখিত প্রশ্নোত্তর নকল করা সুরু করিবামাত্র হেড মাষ্টার ভুবনবাবু প্রভুর কাছে আসিয়া বলিলেন "জগৎ, তুমি ওকে খাতা দেখাচ্ছ কেন ?" প্রভু উত্তর করিলেন "কই, আমি তো ওকে খাতা দেখাই নাই।" ঐ কথায় ভুবনবাবু একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না।" প্রভু আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীর দিকে না যাইয়া যেদিকে চোখ যায়, সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। পদব্রজে বহুদূর হাঁটিয়া সদরখাদা নামক একটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। প্রভু তখন বৈকুণ্ঠ প্রামাণিক নামক এক নমঃশূদ্রের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কাঁচাসোণার পুতুলটিকে দেখিয়া সেই ব্যক্তির প্রাণ জুড়াইয়া গেল। বামনের চাঁদ হাতে পাইলে যে আনন্দ হয়, তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দভরে তিনি প্রভুর

সেবায় যত্নবান হইলেন। প্রভু স্বহস্তে রান্না করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে ভক্তবর সিদ্ধপক্ক আতপান্নের যোগাড় করিয়া দিলেন।

তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া সে রাত্রি প্রভু তাহার গোশালায় যাপন করিলেন এবং প্রত্যূষে নৌকাযোগে গোয়ালন্দ অভিমুখে রওনা হইলেন। গোয়ালন্দ হইতে প্রভু পদব্রজে ভবদীয়া নামক গ্রামের মধ্য দিয়া রাজবাড়ী আসিলেন। তথা হইতে ট্রেণে কলিকাতায় পৌঁছিয়া মদন মিত্রের লেনস্থ ঠাকুর অতুল চম্পটীর বাসায় উপনীত হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভুকে দেখিয়া চম্পটী ঠাকুর প্রথমে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে সমস্ত শুনিয়া সেই দিনই ফরিদপুর গোপাল চক্রবর্ত্তীর কাছে পত্রদ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

ওদিকে প্রভু স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া না যাওয়ায় সকলেই নানা দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। দিগম্বরী দেবীর তো আহার নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ হইয়াছিল। চম্পটী মহাশয়ের চিঠিখানি তাঁহাদের প্রাণে সান্ত্বনার সঞ্চার করিল। সকলে তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "অমন কচিছেলে রিক্তহস্তে কি ক'রে কলিকাতা পৌঁছ্‌ল"। গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভুকে আনিবার জন্য অবিলম্বে কলিকাতা রওনা হইলেন। কয়েকদিন পর প্রভুকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পুনর্ব্বার প্রভুকে উক্ত জিলাস্কুলে পড়াইবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু কিছুতেই তিনি ঐ স্কুলে আর পড়িতে রাজী হইলেন না।

রঁাচীতে প্রভু

বাড়ীতে আসিবার কিছুদিন পর আর একদিন প্রভু সকলের অগোচরে রঁাচীতে তারিণী চক্রবর্ত্তীর নিকট যাত্রা করিলেন। তারিণীবাবু তখন রঁাচীর ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর ছিলেন। পুরুলিয়া ষ্টেসনে নামিয়া সেখান হইতে প্রভু একখানি গাড়ী করিয়া অগ্রজের বাসায় পৌঁছিলেন। দরজার সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া গাড়ীর বাহক 'বাবু' 'বাবু' করাতে তারিণীবাবু ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" প্রভুই উত্তর করিলেন "আমি।" পুনরায় তিনি প্রশ্ন করিলেন "আমি কে?" প্রভু অধিকতর মধুরস্বরে উত্তর দিলেন "আমি জগৎ।" তারিণীবাবু তখন বাহিরে আসিয়া গাড়ীর বাহককে বিদায় দিয়া, প্রভু কোথা হইতে কি ভাবে আসিলেন আদ্যোপান্ত শুনিলেন। প্রভু এখানে পড়িবার জন্য আসিয়াছেন জানিয়া উক্ত ১২৯২ সালের মাঘমাসে রঁাচী হাইস্কুলের থার্ড ক্লাসেই তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

এখানে প্রভু অধিকাংশ সময় স্বভাবসুলভ ধ্যানাবিষ্ট থাকিতেন এবং খোল করতালে কীর্ত্তনের রোল শুনিলে সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার অসাধারণ ভাববিহ্বলতা দেখিয়া সজ্জনমণ্ডলী বহুল প্রশংসা করিতেন। প্রভুর অলৌকিক রূপে ধীরত্ব ও বীরত্বের পৌরষতেজ ফুটিয়া বাহির হইত। অমানদ নির্জ্জনপ্রিয় প্রভু আমাদের যেমন ধ্রুব-প্রহ্লাদ ও সুবল-

মধুমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিতে ভালবাসিতেন, তেমনি অর্জ্জুন উদ্ধব ও নেপোলিয়ন গ্যারীবল্‌ডীর দেশাত্মবোধের প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন। প্রভুর মধুর রূপ ও গমন ভঙ্গী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

এই সময় একটা অতীব কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিল! তারিণীবাবুর বাসার সন্নিকটে এক রায়বাহাদুর উপাধিধারী ভদ্রলোকের একটী খুব দুর্দ্দমনীয় ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল। যত বড় অভিমানী অশ্বারোহীই আসুক্ না কেন, বীরদর্পে ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চাবুক দেওয়া মাত্র অদ্ভুত অশ্বটি তাহাকে ফেলিয়া দিত। প্রভু কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার বঙ্কিম নয়নে এই ঘটনা লক্ষ্য করিতেন। একদিন তিনি মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে উক্ত অশ্বপুঙ্গবের মালিককে বলিলেন "দেখুন, আমি কিন্তু আপনার ঘোড়াটিকে ঠিক ক'রে দিতে পারি!" প্রভুর কথা শুনিয়া তারিণীবাবু সভয়ে বলিতে লাগিলেন "জগৎ, তুই কি জানিস্‌নে যে, ঐ ঘোড়ার দাপটে কত খুন হয়ে গেছে! সাবধান, ওরূপ দুঃসাহস দেখাস্ নে।" তখন প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ঘোড়া ত ঘোড়া! কত সিংহ ব্যাঘ্রকে মুষিক ক'রে খেল্‌তে জানি।"

সত্যই কয়েকদিন পর একদিন প্রভু খুব উৎসাহভরে রাস্তার পাশ হইতে ঘোড়াটিকে লইয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের মত বীরবেশে উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতবেগে বহুদূরে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তারিণীবাবু অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীর সহিত জগতের ঐ অসম সাহসের পরিচয়ে একদিকে যেমন

বিস্মিত হইলেন অন্যদিকে তেমনই মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কা হইতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল কিন্তু প্রভু ফিরিতেছেন না দেখিয়া চারিদিকে অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করা হইল। ইত্যবসরে সমবেত জনমণ্ডলীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া সহাস্যবদনে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, অশ্বপৃষ্ঠে প্রভু যথাস্থানে পৌঁছিলেন এবং নিরীহ মৃগশিশুর মতই অশ্বটা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার পর হইতেই অশ্বটার সেই দুর্দ্দমনীয় ভাব দূরীভূত হইয়া গেল। দুর্দ্দান্ত পশুশক্তিও যে প্রভুর ইঙ্গিতের বশ, এই ঘটনায় তাহাই প্রমাণিত হয়।

প্রভুর রাঁচী অবস্থানকালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়। তারিণীবাবুব বাসার পাচকের স্বভাবচরিত্র সন্তোষজনক ছিল না। প্রায়ই সে জিনিষপত্র এধার-ওধার করিত। প্রভুর আগমনে তাহার চৌর্য্যবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। প্রভুও একাসনে অনেকসময় উদাসীনভাবে বসিয়া থাকিতেন। ইহাতে পাচক মনে করিত যে, প্রভু তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। এইজন্যই সে একদিন প্রভুর খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দিল। ফলে প্রভু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। লক্ষণাদি দেখিয়া তারিণীবাবু বিষপ্রয়োগ সন্দেহ করিলেন। পাচককে ভয় দেখাইলে সেও উহা স্বীকার করিল। অবিলম্বে একজন চিকিৎসক ডাকা হইল। সামান্য চেষ্টাতেই প্রভু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারিণীবাবু নিজে নানাকাজে ব্যস্ত থাকার জন্য প্রভুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে পাছে পুনরায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

পাবনায় প্রভু

(পঠদ্দশায়)

মাসাধিককাল ব্রাহ্মণকান্দা থাকিবার পর প্রভু পাবনায় গোলোকমণি দেবীর কাছে আসিলেন এবং ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক মাসে পাবনা জিলা স্কুলে থার্ড ক্লাসেই ভর্ত্তি হইলেন। প্রভুর যে পতিতোদ্ধারণকার্য্য, তাহা এই পাবনা হইতেই প্রথম আরম্ভ হয়। প্রভু এখানে আসিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নামে-প্রেমের উন্মাদনা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। পাবনাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথম ছাত্রদের লইয়া কীর্ত্তনচর্চ্চা আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান ধ্বংসপ্রলয়ঙ্কর যুগে কীর্ত্তনই যে পরম কর্ত্তব্য এই বার্ত্তাও পাবনাতেই প্রথম ঘোষণা করেন। রণজিৎ লাহিড়ী, হরি রায়, নিত্যগোপাল কবিরাজ প্রভৃতি এখানে প্রভুর অন্যতম সঙ্গীরূপে পরিণত হন। তিনি মাঝে মাঝে উহাদের সঙ্গে সংকীর্ত্তনরঙ্গে তন্ময়ভাবে অবস্থান করিতেন।

পাবনাতে প্রভুর দেহশ্রী শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল। বাড়ীর ছোট ছোট শিশুসকল কি জানি কেন ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজার অভিপ্রায় প্রকাশ করিত। ঐ সময়ে প্রায়ই তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া পড়িত। স্কুলে গিয়া ক্লাসের মধ্যে সময় সময় আত্মস্থ হইয়া পড়িতেন। বাহ্যতঃ প্রভু অনেক সময় চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকিলেও বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

এক সময়ে বহু ডাকাডাকিতেও সাড়া দিতেন না। কখনও বা 'উঃ' এই শব্দ করিয়াই পুনরায় নীরব হইতেন।

ইতিপূর্ব্বেই একদল স্কুলের বালক প্রভুর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু শ্রীহস্তে লিখিয়া লিখিয়া তাহাদের উপদেশাদি দেওয়া আরম্ভ করিলেন। "ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম" এই দুইটী ছাড়া যে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় না, ইহাই তাঁহার উপদেশাবলীর সারমর্ম্মরূপে অবধারিত হইত। সংযম, নিষ্ঠা, শুদ্ধাচার প্রভৃতি আপনি আচরণ করিয়া অনুবর্ত্তীদিগকে শিক্ষা দিতেন। অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসী হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা তাঁহার এই পাবনার কৃতিপদ্ধতি আলোচনা করিলেই বোধগম্য হইবে।

অন্যান্য মহাপুরুষেরা প্রভুর ঐ বয়সে ধর্ম্মানুরাগ প্রাবল্যে উপযুক্ত আচার্য্যের সন্ধাননিরত আছেন। সাধন কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদানেই তাঁহারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু মাত্র পঞ্চদশবর্ষ বয়ক্রম হইতেই প্রভু স্বয়ং আচার্য্যের আসনে সমাসীন এবং ভাবটাও অতি অভিনব। কাহাকেও প্রভু আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদান করেন না। অপরের প্রাণাকর্ষী একটা মধুর ভাবের তাঁহাতে ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। দলে দলে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত আদেশ উপদেশ শুনিবার জন্য ঐ সময় হইতে পাগলপারা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাতির কল্যাণদেবতা প্রভু তখন দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ যে ছাত্রগণ, তাহাদের নৈতিক অধঃপতন দেখিয়া ব্যথাকাতর হইয়া উঠিয়াছেন। কি প্রকারে ছাত্রসমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতে

পারে, ছাত্রসুহৃদ্ প্রভু তখন সেই চিন্তাতেই বিভোর থাকিতেন। তিনি দেখিলেন, ছাত্রদের মধ্যে দিন দিন সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত অভাব হইয়া পড়িতেছে। ছাত্র তরুণের দল বিকৃত শিক্ষার মোহে আর্য্যভারতের ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শ ভুলিয়া কেবলই তরলতা চায়। তাহাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপগুলি বিজাতীয় আদর্শে সম্পন্ন হইতেছে। যে ভারতে একদিন ব্রহ্মচর্য্য সাধনা তথা নিবৃত্তিযোগের ভিত্তির উপরেই ছাত্রদের উন্নতির প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে প্রাসাদ আজ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সত্যিকারের জ্ঞানলাভ না হইয়া বিদ্যা হইয়াছে অর্থকরী, কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। জাতির জীবনও দিন দিন নানা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে। অভাব অভিযোগের দাবদাহনে যুবক সমাজ আজ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যালাভই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন ঃ—"পড়ে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥" আবার যাহাদের বিদ্যালাভের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য ভুল হইয়া যায়, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ—"তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক কোলাহল।" এইরূপে যেদিন হইতে ভারত প্রতীচ্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই মূলে ভুল হইয়া গিয়াছে। ইংরেজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের আদিযুগে হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ ডিরোজিয়ো, মেকলে প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষাব্রতীগণ নব্যশিক্ষিতদের যে মন্ত্র দিয়াছেন, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্যভ্রষ্ট

করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যে দেশে প্রকৃত শিক্ষারই অভাব থাকে, সে জাতির উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর নহে।

প্রভু আমাদের তাই ভারতীয় ছাত্রজীবনের আদর্শ কি, বর্ত্তমানযুগে কিরূপভাবে আবার তাহারা ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থলরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহাই স্বকীয় ছাত্রাবস্থায় সম্যক্ আচরণদ্বারা দেখাইতেছেন। শত শত অস্ফুট কুসুম-কলিকে সৌরভবিস্তারের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ধ্যানধারণা ও কীর্ত্তনমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে তিনি অধ্যয়নশীল থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। ছাত্রগুরুরূপেই তিনি তখন প্রতিভাত হইতেছেন।

এদিকে অভিভাবকশ্রেণী ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ দেখিতে পাইয়া বিষম প্রমাদ গণিলেন। যে ভারতে পিতামাতাই ছিলেন সন্তানের আদিগুরু, সেখানে আজ তাহারাই মায়া-প্রপঞ্চের অধীন হইয়া প্রভুর প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। তাহার সোনার চাঁদটি যে কুসংসর্গে পড়িয়া দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। আর প্রভু তাহাকে সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের পথে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ইহাতে যত অপরাধ হইল প্রভুর। প্রভুর উপর খড়গহস্ত হইয়া তাঁহারা নানা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবারও ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

অন্তর্যামী প্রভুর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু বাধার ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শতাধিক ছাত্র এই সময়ে

নিত্য প্রভুব নিকটে যাতায়াত করিত। প্রভু তাহাদের সঙ্গে অবৈধভাবে কোনরূপ মেলামেশা করিতেন না। এমন কি, কাহাকেও স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। ছাত্রদের প্রতি প্রভুর আদেশ উপদেশের কিরূপ ধাবা ছিল, তাহা ছাত্রদেব মধ্যে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বাণীসমূহ হইতেই প্রতীয়মান হইবে। যথা:—"গ্রাজুয়েট্ না হয়ে কেহ পড়া ছেড়ো না। মূর্খে আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। অজ্ঞানের হরিভক্তি হয় না। বি, এ; এম, এ; পাশ করো বিদ্যোন্নতি, বিদ্যাস্মৃতি, বিদ্যানুশীলন। খুব ভাল ক'রে পড়ো। বেশ ক'রে মুখস্থ ক'রে রাখ। পাঠে ও আমার কথায় আদৌ অবহেলা করো না। পড়িও; স্বস্তি ও আনন্দে রহিও। অসখ্য হইও।" 'ব্রহ্মচর্য্য করিও, করাইও। সাম্য হইও। পৃথিবীতে একা ভাবিও। ত্যাগই সুখ, বৈরাগ্যই ভাগ্য। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহাকে কদাপি প্রশ্রয় দিও না। বাহ্যলক্ষ্য ত্যাগ করো। দৃষ্টিপূতঃ পথ—মনঃপূতঃ বৈরাগ্য—মনে রাখিও। যোষিৎ ও বালকাদি পরিহার করিও। বালক বিপদ; স্ত্রী বিপদ। একত্র শয়ন, উপবেশন, গমন ও সম্ভাষণ কর্‌লে এক শরীরের পাপ আর এক শরীরে প্রবেশ করে। কাহাকেও স্পর্শ করিবে না। স্পর্শ করা মহাপাপ।"

"স্পর্শ ও উচ্ছিষ্টে শরীরের যত অনিষ্ট হয়। শরীরে তাপ জন্মে; মানুষ অপবিত্র হয়। ব্যাধি হয়ে শেষে ভুগে ভুগে মরে। কারো মুখের দিকে চাইবে না। মুখে মায়া। অন্যকে

দেখাই পতন। পদে পদে সাবধান হ'য়ো। মাটীর দিকে চেয়ে পথ চলো।"

"কারো ব্যবহারের জিনিস ব্যবহার করো না। গায়ের রক্ত জল করা অভ্যাসটি ছাড়িও। কেহ গায়ের রক্ত জল করিয়া আয়ু ও বংশ নষ্ট করিও না। বাক্ সংযত, মৌনী হও। আলস্য চিরত্যাগ ক'রে শরীর সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর্‌বে। আত্মশুচিতে বপু রক্ষা হয়। লোভ, কাম, চক্ষুদোষ ও অভিমান চিরত্যাগ কর্‌বে। আলস্যে কলির আক্রমণ হয়। ভ্রমে ফেলে দেয়।"

"চৈতন্য লাভ করো। নৈষ্ঠিক হও। ধর্ম্মে জয়যুক্ত রও। আত্মসংযমই আত্মরক্ষা। সদা পবিত্রতা, সদা নিষ্ঠা। নিষ্ঠাই আরোগ্য। অনিষ্ঠাই ব্যাধি ও মৃত্যু। কারো বাতাস গায় লাগ্‌তে দিবে না। নৈষ্ঠিক হলে কেউ তার কাজে বাধা দিতে পারে না। বৃথা কথা বলো না। বৃথা বাক্যব্যয়ই দুর্ভাগ্য। কথোপকথনকে কলহ কহে। নিজেকে বড় জ্ঞান করিও, তা নইলে কদাচ কিছু করিতে পারিবে না। স্বপদে ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও। শরীর, মন ও প্রাণ দ্বারা ধর্ম্মকে রক্ষা করা উচিত। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোন প্রকারের বিপদ হয়, সেও ভাল। কারণ ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা ও পরম ধন।"

"তোমরা কেহই দীক্ষা লইও না। দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র। গুরু অভিপ্রেত কার্য্যকেই গুরুদীক্ষা বা গুরুপ্রণালী বলা যায়। তারক ব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র। ইহা গুপ্ত

নহে—সর্ব্বদা প্রকাশ্য। ভবসমুদ্র পার করিতে যিনি সমর্থ তিনিই গুরু। "যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি সে-ই গুরু হয়।" শ্রীকৃষ্ণই যুগে যুগে গুরুরূপে উদ্ধার করিতে আসেন। গুরু ও কৃষ্ণ একজন। গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু বন্ধু। আমি জগদ্গুরু। মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে। জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে॥"

"যেখানে সেখানে যাস্‌নে। ওতে চিত্ত মলিন হয়। কেউ ভাব ও অবস্থা বুঝে কথা বলে না। তাই শান্তি হয় না।' লক্ষ্য ছেড়ে ঘুরে মরে। তোরা আর কদাচ কোথায়ও যাস্ নে। একালে, ওকালে, ত্রিকালে এই ফকিরের কাছেই থাকিস্।"

"দেহ, মন ও জীবনপণ করিয়া হরিসাধন করিতে হয়, এমত স্থলে সম্পূর্ণ কঠোর করিতে বৈমুখ হওয়া উচিত নয়। হরিনাম নিষ্ঠা ও পবিত্রতার বল বাঁধ। তোমরা হরিনাম ক'রে আমায় পালন কর। ভাল ক'রে কীর্ত্তন না করলে পাপ হয়। উচ্চ কীর্ত্তনে পাপ নষ্ট করে। হরিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করবে যেন সহস্র হস্ত দূর হতেও শোনা যায়।"

"দেখ, সংসারে হরিনাম প্রচার করা বড় কষ্ট। মানুষ কেবল হুজুগ চায়, হৈ চৈ ভালবাসে। তোমরা হুজুগ করো না। ধীরে, মহাপ্রেমে, নিতাই নিষ্ঠায়, নিত্যানন্দ স্মরণে চলে যাও। হতাশ হয়ো না। আমি আছি, ভয় কি? হরিনামে প্রাণমন শীতল রেখে চল্‌তে থাক।"

"আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক্। তোমাদের মঙ্গল হউক। তা হ'লেই আমার

উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে নাও, আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নই।"

প্রভুর মধুর মূর্ত্তিখানি ছাত্রগণের প্রাণপটে সতত অঙ্কিত থাকিত। সহপাঠী ও সমবয়সী মাত্রেই প্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। ঐ ভালবাসার মধ্যে অনন্যসাধারণ ভক্তিভাব ছিল বলিয়া ভ্রমেও তাহারা প্রভুর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করিতে সাহসী হইত না। প্রভুর শ্রীমুঁখের কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা তাহারা লালায়িত থাকিত।

এদিকে প্রভুর উপর ক্রমে অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। একদিন ঊষাকালে প্রভু স্নানে যাইবার সময় দুর্ব্বৃত্তগণ দূর হইতে অঙ্গচ্ছটা দেখিয়াই প্রভুর আগমন বুঝিতে পারিল। প্রভু যখন ধীরে ধীরে নদীতে নামিতেছেন, এমন সময় দুষ্টগণ একে একে আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিল। নিত্য প্রভু স্নান করিতে আসেন জানিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

দুর্ব্বৃত্তেরা প্রভুকে জলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। অতঃপর তাহারা তুলিয়া দেখিল যে, প্রভু সমাধিস্থের ন্যায় অসার হইয়া রহিয়াছেন। তখন তাহারা ভয়ে প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। বাড়ীতে দেবী গোলোকমণি, "জগৎ প্রাতঃস্নান করতে গেল, আর ফিরে আসে না কেন?" এইরূপ ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন শিবপূজা করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু পুষ্পচন্দন সব পুষ্পপাত্রেই পড়িয়া রহিল।

এমন সময় প্রবোধ আসিয়া সংবাদ দিল, "মা, নদীর ধারে মামাকে ঘি'রে অনেকে ব'সে আছে।"

পীড়নকারীদের মধ্যে সেদিন বনোয়ারী সান্ন্যাল, কেশব লাহিড়ী, জগদীশ লাহিড়ী প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। প্রবোধের কথায় প্রভুর উপর অত্যাচার হইয়াছে মনে করিয়া দেবী গোলোকমণি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নানারূপ অশিব চিন্তায় দুই হাতে তিনি চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

ইহার অল্পক্ষণ পরে তিনি দ্রুতবেগে আসিয়া শিবমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী রাধাগোবিন্দের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুর্ব্বৃত্তদের পরামর্শে বাড়ীর চাকরটি পুনরায় তাহাকে ধরিয়া লইবার জন্য পশ্চাৎ ধাওয়া করিয়াছে।

প্রভুর পশ্চাতে চাকরকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া দেবী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "কি রে, তোর এত বড় সাহস! বাড়ীর চাকর হ'য়ে আমার ভাইকে ধ'রে নিতে এসেছিস্!" ভৃত্য উত্তর দিল, "মা, আমার কোন দোষ নাই। জগদীশবাবু ধ'রে নিতে বলেছেন।" জগদীশ লাহিড়ীর এই সব কাণ্ড শুনিয়া দেবী অধিকতর কোপমুখে বলিলেন, "নে তো! তোর কতখানি শক্তি দেখি! আমার সম্মুখ থেকে ওকে নিবি!" এই বলিয়া তিনি উহাদের লক্ষ্য করিয়া গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

গোলোকমণি পীড়নকারীদের গালমন্দ করিতেছেন শুনিয়া তিনি দিদির কোলের কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "দিদি, ওরা ত আমার কিছুই করে নি। আমায়

নিয়ে একটু খেলা করেছে মাত্র। আপনি শিবপূজা করতে বসেছেন, আপন মনে পূজা করুন্। পূজায় ব'সে ওরূপ রাগ ও অভিসম্পাত করতে নেই। ওতে ওদের অমঙ্গল হ'বে।" এই ঘটনার কয়েকদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি অনুগত বালকদিগকে বলিয়াছিলেন, "এই শরীরের উপর অনেক অত্যাচার হবে, কিন্তু একেবারে কেউ মেরে ফেল্‌তে পারবে না।

ব্রাহ্মণকান্দায় আগমন ও পাবনা প্রত্যাবর্ত্তন

দিগম্বরী দেবী তাঁহার প্রাণের প্রাণ জগতের উপর নির্য্যাতনের কথা শ্রবণ করিয়া পাগলিনীপারা হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়েই প্রবোধ লাহিড়ীর উপনয়ন উপলক্ষে পাবনা আসিয়া জগতকে তিনি ব্রাহ্মণকান্দা লইয়া গেলেন। ইহা ১২৯৫ সালের ফাল্‌গুন মাসের কথা। যে অবস্থা লইয়া তিনি পাবনা গিয়াছিলেন, আজ আর তাহা নাই। তাঁহার হাবভাব অভূতপূর্ব্ব-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই বৎসর তিনি সেকেণ্ড ক্লাস হইতে ফার্ষ্ট ক্লাসে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বয়স মাত্র সতর বৎসর। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মধ্যে অলৌকিক অনেক কিছু পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার তখনকার ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া নানাজনে নানাকথা বলাবলি করিত। কেহ কেহ বলিত, "নিশ্চয়ই পাগল হয়েছে।" আবার কেহ কেহ বলিত, "না, গো না, পরীর দৃষ্টি পড়েছে!" স্নেহপূর্ণা দিগম্বরী সকলের সকল কথাই শুনিতেন, আর মনঃপ্রাণে রাধাগোবিন্দের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণাধিক জগতের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় সেই হাসিচাপল্য আর ফিরিয়া আসিল না।

বরং দিন দিনই তিনি অধিকতর নির্জ্জনতাপ্রিয় ও কীর্ত্তনামোদী হইয়া উঠিলেন। উহাতে দেবী একদিন মনে মনে ভাবিলেন, "জগতের ওজন ক'রে হরির লুট দেবার কথা ছিল, তা না দেওয়ায়ই বোধ হয় এরূপ ভাব হয়েছে।" তাঁহার কাছে ঐ সংকল্পের কথা প্রকাশ করিলে তিনি পরম আনন্দিত মনে বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, তবে তাই দিন। হরির লুট দিন। আমি তা হ'লেই ভাল হয়ে যাব।"

পরদিন সকালবেলা দিগম্বরী দেবী তাঁহাকে স্নান করাইয়া ভোলানাথ সাহার কারখানায় লইয়া গেলেন। ভাগ্যবান সাহাজী তাঁহাকে ওজন করিয়া বলিলেন, "একমণ দশসের।" গ্রামময় সাড়া পড়িয়া গেল, "আজ জগদ্বন্ধুর ওজনে হরির লুট।" ঐ উপলক্ষে সেদিন বহু কীর্ত্তনীয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। তিনি রাধাগোবিন্দের মন্দিরের বারান্দায় একখানি কাপড়-ঘেরা স্থানে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর কীর্ত্তনের তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে স্বহস্তে তিনি অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া লুট ছড়াইতে লাগিলেন। প্রভুপ্রদত্ত লুট পাইয়া পরমানন্দে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আজ তিনি আশপাশের কীর্ত্তনীয়াদের কীর্ত্তনের ভঙ্গী অবগত হইবার সুযোগ পাইলেন। অনেক মহাজনী গান তিনি শুনিলেন বটে কিন্তু ব্রজরসতত্ত্ব ও গৌর-নিত্যানন্দ মাধুরী যেন ঐ সমুদয় গানের মধ্যে সম্যক্ বিকশিত দেখিতে পাইলেন না। তখন হইতেই তিনি কীর্ত্তন গান রচনায় ব্রতী হইলেন। ইহার পর হইতে ব্রজলীলা ও গৌরলীলা সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত গান

রচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই—(১) নাম-সংকীর্ত্তন (২) শ্রীমতী-সংকীর্ত্তন, (৩) পদাবলী-কীর্ত্তন, (৪) বিবিধ সঙ্গীত, (৫) হবি-কথা প্রভৃতি নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

মাসাবধিকাল ব্রাহ্মণকান্দা থাকিবার পর পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে ভাবিয়া পুনবায় তিনি পাবনা যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। তিনি যখন যাহা সংকল্প কবিতেন, তাহা না করিয়া কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। তাঁহাকে ঐ শত্রুপুরীব মধ্যে পাঠাইবার ইচ্ছা দিগম্বরী দেবীর আর ছিল না। তিনি কিন্তু নিঃশঙ্কচিত্তে পাবনা উপস্থিত হইলেন।

পাবনায় পঠদ্দশায় তিনি ভক্তিভাবের প্রকট বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। সাধু-বৈষ্ণব দেখামাত্র দূর হইতে গড় হইয়া প্রণাম করিতেন। নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় তুলসীতলায় মাথা নোয়াইতেন। কোন বাড়ীতে কীর্ত্তনের কথা শুনিলেই সেখানে গমন করিতেন। কীর্ত্তনে উন্মাদনা প্রভুর স্বাভাবিক ছিল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া পড়িত। একদিন কীর্ত্তনোন্মাদ অবস্থায় জনৈক বিরুদ্ধবাদী প্রভুর পায়ের উপর একটি টিকা পোড়াইয়া চাপিয়া ধবিয়াছিল কিন্তু ঐ স্থান পুড়িয়া গেলেও তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল না।

অন্য একদিন তাতীবন্ধ নামক একটি গ্রামে কীর্ত্তন শুনিতে যান। ভাবোন্মাদ অবস্থায় সেখান হইতে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে একটি পুকুরের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অকস্মাৎ পরিচিত এক ভদ্রলোক ঐ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাদরে কোলে করিয়া গোলোকমণি দেবীর নিকট পৌছাইয়া

দেন। দেবী তাঁহার সেবাশুশ্রূষার দ্বারা চৈতন্য সম্পাদন করেন। ঐ সময়ে কোন কোন দিন তাঁহাকে সমগ্র দিবারাত্রও তন্ময় হইয়া থাকিতে দেখা যাইত। কখন কখন 'হরি হরি' বলিয়া উদ্দণ্ডনর্ত্তন করিতে করিতে সহসা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইতেন। উহাতে সুচারু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তধারা ছুটিত। প্রভুর অসামান্য কীর্ত্তনানুরাগ দেখিয়া গোলোকমণি ও আর আর আত্মীয়স্বজন তাঁহার জীবন রক্ষার বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন হইতে তাঁহারা নানা উপায়ে কীর্ত্তনে যাইতে বাধা দিতে লাগিলেন। প্রভু কিন্তু কোন বাধাই মানিতেন না। একদা পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে কীর্ত্তনের রোল শুনিয়া তিনি সেখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু গোলোকমণি যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি তাহাতে নিরস্ত না হইলে ক্রোধভরে দেবী প্রভুকে দ্বিতলের একটি কুঠরীতে তালাবন্ধ করিয়া রাখিলেন। নিরুপায় তিনি তখন ঐ কুঠরীর মধ্যেই কীর্ত্তনের তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে করিতে ধরাস্ করিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেলেন। জানালা দিয়া ঐ করুণ দৃশ্য দেখিয়া দেবী ব্যস্তসমস্তভাবে তালা খুলিয়া বহুকষ্টে প্রভুকে সুস্থ করেন। ইহার পর কীর্ত্তনে যাইতে আর কেহই বাধা দিতে সাহসী হইতেন না।

অন্য একদিন তিনি কোন বাড়ীতে কীর্ত্তনের শব্দ শুনিতে পাইয়া ঐ দিকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে পথিমধ্যে একটি ড্রেনের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে তখন ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। ঐ

দিবসও অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সারাদিন এবং রাত্রিরও বহুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে প্রভুর যাত্রাগান শুনিবারও বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাবনায় বহুদিন যাত্রাগান শুনিয়াছেন। গান আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি স্বতন্ত্র একটি আসনে কাঁচা সোনার পুতুলটির মত গিয়া উপবেশন করিতেন আর গানের শেষে লোকসংঘট্ট কমিলে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেন। পাবনায় একদিন ধ্রুব ও অন্য একদিন প্রহ্লাদের অভিনয় শুনিয়া আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ধ্রুব প্রহ্লাদের অকৃত্রিম ভক্তি বিশ্বাসের কথা প্রায়ই অনুগত বালকদের বলিতেন।

পাবনায় প্রভু জয়কালী মাতার মন্দিরে, অন্যান্য দেবালয়ে ও লাহিড়ী বাটীর বহির্ভাগে কেলিকদম্বমূলে অনেক সময় গিয়া বসিয়া থাকিতেন। সদাসর্ব্বদা কি যে ভাবিতেন, আপনমনে কি যে বলিতেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। প্রভুর নানারূপ অলৌকিক শক্তির কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় একে একে বহু লোক তাঁহার শরণাগতি গ্রহণ করিতে লাগিল। সমাগত প্রত্যেককে প্রভু উপদেশ দিতেন। মানবজীবনের সত্যিকার কর্ত্তব্যকর্ম্মের দিকে সকলকেই তিনি উন্মুখ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন।

তাড়াসের জমিদার পরমবৈষ্ণব রাজর্ষি বনমালী রায়ও প্রভুর কথা শুনিয়া একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্য ও অভিনব

হাবভাব দেখিয়া মুগ্ধ হন। ইহার পর মধ্যে মধ্যে তিনি প্রভুর নিকট যাতায়াত করিতেন। প্রভুও তাঁহার সহিত অতি মধুরভাবে ভাগবত কথা আলোচনা করিতেন।

দ্বিতীয় বার প্রহার

দ্বিতীয়বার পাবনা আসিয়া প্রভু পড়াশুনায় মনোযোগী হইলেন। অত্যাচারকারীদের সম্মুখেও তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া উহারা আবার নানা কুপরামর্শে ব্রতী হইল। উহা অনুভব করিয়া তিনিও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগবৈরাগ্য ও প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। রমেশ লাহিড়ীর আত্মজ রণজিৎও প্রভুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতেন। কিন্তু আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাঁহার সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেন। রণজিৎ কিন্তু ঐ নিষেধ মানিতেন না। উহাতে আত্মীয়গণ একদিন তাঁহাকে দ্বিতলে গৃহমধ্যে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি উহাতে প্রভুর দর্শনের জন্য অত্যধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরে দিগ্-বিদিক্ জ্ঞানহারা বালক ঐ গৃহসংলগ্ন বারান্দা হইতে রাস্তায় লম্ফ প্রদান করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি কোনপ্রকার আঘাত পাইলেন না এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া প্রভুর নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহাকে সযত্নে বসাইয়া স্নেহসুললিত ভাষায় বলিলেন, "এরূপ হটকারিতা আর করো না। তোমার অভিভাবকদের বলো, 'আমি বল্‌ছি, তুমি খুব বিদ্বান হবে।' তাঁহারা যেন আমার নিকট আস্‌তে বাধা না দেন।"

আর একদিন প্রভু রণজিতের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, থানের

কাপড় উত্তরীয় আকারে পরাইয়া এবং গলায় তুলসীমালা দিয়া, সরল ভাষায় বৈরাগী সাজাইয়া তাঁহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। রণজিতের ঐ বেশ দেখিয়া এ যে প্রভুরই কাণ্ড তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না। তিনি যেন পুনরায় নির্য্যাতন নিপীড়ন স্বেচ্ছায় বরণ করিবার জন্যই এই কার্য্য করিলেন। দুর্ব্বৃত্তেরাও এবার তাঁহাকে রীতিমত সাজা দিতে হইবে সংকল্প করিয়া সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ঐ সময় তিনি নিশাকালে একাকী পথে-প্রান্তরে বিচরণ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর উহারা তাঁহাকে পথের মধ্যে ধরিয়া ভীষণ প্রহার আরম্ভ করিল। নিদারুণ প্রহারের ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে ঐ অবস্থায় তাঁহাকে বৈদ্যনাথ চাকীর বাড়ীতে ফেলিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করিল। চাকী মহাশয় তাঁহার ঐ অবস্থাকে ভাবাবস্থা মনে করিয়া সযত্নে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের মধুর রোলে তাঁহার প্রহার-যন্ত্রণা দূর হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের তালে তালে তিনি দুলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-বিকারগুলি ঐ বরঅঙ্গে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথমে তিনি শায়িত অবস্থাতেই নৃত্যভঙ্গী করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঘর হইতে বারান্দা ও বারান্দা হইতে উঠানে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। আকুলতা ব্যাকুলতা চরম দশায় আসিয়া উপনীত হইল। পাপ-

প্রলয়াঘাত-জনিত প্রভুর বেদনারাশিও একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গেল।

দশম শ্রেণীতে উঠিবার পরেই প্রভুর উপর প্রথম নির্য্যাতন হয়। অতঃপর কিছুদিন ব্রাহ্মণকান্দা থাকিয়া পুনরায় প্রভু পাবনা আসিলে দুরন্তেরা প্রভুকে দ্বিতীয়বার পীড়ন করে। প্রভুর দ্বিতীয়বার প্রহারের কথা রাজর্ষির কর্ণগোচর হইল। অবিলম্বে তিনি প্রভুকে স্বভবনে আনয়ন করিবার জন্য হস্তীসহ একজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিলেন। গোলোকমণি দেবী প্রভুর দ্বিতীয়বার প্রহারের পর নিতান্ত শঙ্কাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। সততই তিনি ভাবিতেন, "জগৎকে কোন্‌দিন হয়ত মেরে ফেলে দেবে।" এই অবস্থায় রাজর্ষির প্রেরিত লোক প্রভুকে লইতে আসিল। দেবী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। "রাজার দৃষ্টি যখন জগতের উপর পড়েছে, তখন আর কোন চিন্তা নাই"—এই মনে করিয়া প্রভুকে তিনি রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রভুর আগমনের পর রাজর্ষি প্রহারকারীদের নাম জানিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। "অমন অপাপবিদ্ধ শরীরের উপর যে পাষণ্ডেরা ঐরূপ নির্ম্মম আঘাত করিতে পারে, তাহাদের যথোচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন", রাজার মনের এই ভাবটিও প্রভুর নিকট প্রকাশিত হইল। কিন্তু পরম দয়াময় প্রভু কাহারও নাম না করিয়া একখণ্ড কাগজে নিম্নলিখিত ছত্র দুইটি লিখিলেন এবং উহা রাজর্ষির হস্তে প্রদান করিলেন। উহাতে লেখা ছিল ঃ—

পাপরূপ হিমাচল শিরোদেশে ছিল।
লাহিড়ী পবন বেগে উড়াইয়া নিল ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপের জগাই মাধাই উদ্ধাবণ ব্যাপারে পরমদয়াল নিতাই চাঁদ যেমন "মেরেছে কলসীর কানা। তাই বলে কি প্রেম দিব না॥" বলিয়া ক্ষমার শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন—প্রভুর ঐ কথার দ্বারা কিন্তু আমরা এক অভিনব ক্ষমাশীলতার পরিচয় পাই। প্রভু প্রহারকারীদের দোষী তো করিলেনই না উপরন্তু তাঁহারাঁ যে তাঁহার মঙ্গল করিয়াছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। দীনতা, অদোষদৃষ্টি, ক্ষমা প্রভৃতি মহদ্‌গুণেব একাধারে কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! রাজর্ষির ন্যায় একজন প্রতাপান্বিত ধনীর সাহায্য পাইয়াও প্রভু যে অলৌকিক সংযম ও অহিংসার পরিচয় দিলেন, তাহা বাস্তব জগতে একান্তই দুর্ল্লভ।

প্রভু সম্বোধন আরম্ভ।

রাজর্ষি বনমালী রায়, উকিলপ্রবর জগৎ ভাদুড়ী, বৈদ্যনাথ চাকী, হরি রায়, নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, অদ্বৈতবংশোদ্ভব রঘুনন্দন গোস্বামীপাদ প্রভৃতিই কিশোরসুন্দর জগদ্বন্ধুকে পাবনাতে সর্ব্বপ্রথম 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন। যুধিষ্ঠির-চরিত মহাত্মা দীনবন্ধু বাবাজী ও তৎসহধর্ম্মিণী গৌরপ্রেম-পাগলিনী বিন্দুমাতাও 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া ঐ পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণযাত্রা অভিনয়ে সুদক্ষ, ভক্তপ্রবর, সুগায়ক নীলকণ্ঠের কণ্ঠেও 'প্রভু' 'প্রভু' ধ্বনি উত্থিত হইল। কিছুকাল পরে ধনসম্পদে অতুলনীয় ঠাকুর কালীকৃষ্ণের প্রাণটীও 'প্রভু'

'প্রভু' করিয়া আকুল হইয়াছিল এবং প্রভু দর্শনের তীব্র আকাঙ্খা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে উন্মাদের মত পাবনা সহরে ছুটাইয়া আনিয়াছিল। শান্তিপুরগৌরব রাধিকা গোস্বামী-পাদকেও প্রভুর ভীমশিহরণ বিভুবিভূতি ঐ চরণে সত্যিকার প্রণতিলুণ্ঠন শিখাইয়াছিল। কিন্তু কি রাজর্ষি, কি গোস্বামী-পাদগণ কেহই ইচ্ছামত উন্মুক্ত দরজায় প্রভুর দর্শন পাইতেন না। ক্বচিৎ ক্ষণ মাত্র বিদ্যুচ্চমকবৎ সে সুদর্শন দর্শনে তাঁহারা নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

রাজর্ষি বনমালী রায় প্রভুর অনুগত হইলে তদ্বারা তিনি অপ্রকাশিত গোস্বামী গ্রন্থাবলীর প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি দেখিলেন, নরনারীর প্রবৃত্তি ক্রমেই বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার মোহে কলুষিত হওয়া আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলি এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে ক্রমশঃ উন্মার্গগামী করিয়া তুলিতেছে। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সারাংশস্বরূপ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বা প্রেমভক্তিবাদ, তাহাতে ক্রমেই আমরা আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছি। পক্ষান্তরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সুনির্ম্মল আদর্শ দিন দিন পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। মহাপ্রভু অবতারের অবদানগুলি একপ্রকার লোকলোচনের অন্তরালে অমুদ্রিত পুঁথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

গোস্বামী গ্রন্থাবলীর প্রকাশ

প্রভুর আদেশ অনুসারে রাজর্ষিবর অচিরেই "দেবকীনন্দন প্রেস" নামক একটী প্রকাশক কার্য্যালয় খুলিলেন। ওখান

হইতে ক্রমশঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিছুদিনের জন্য প্রভুকে লইয়া বাজর্ষিবর বৃন্দাবনে যাইবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি সম্মতি দান করিলেন। এই তাঁহার প্রথম বৃন্দাবন যাত্রা। গোলোকমণি দেবী ও পরিবাবস্থ আর আর সকলে এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, শেষে ভাবিলেন "জগৎ যখন বাড়ীতেও যাবে না, আব এখানেও তাঁর উপব যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ হ'য়েছে, তাহাতে কোন্‌দিন কে মেরে ফেলবে বরং কিছুদিন রাজার সঙ্গে বৃন্দাবন ঘুরে আসাই ভাল।"

এই যাত্রায় প্রভু বৃন্দাবনে প্রধানতঃ বাজর্ষির স্থাপিত রাধাবিনোদ কুঞ্জে প্রায় ছয় মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে পাবনা ফিরিবার পথে পাটনা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ঠাকুর অতুল চম্পটীর ভাই ডাক্তার অমূল্য চম্পটীর বাসায় উঠেন। চম্পটী-গৃহিণী ও প্রভুব বাল্যসঙ্গিনী ক্ষীরোদা দেবী তখন ঐ বাসাতে ছিলেন। তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মায়িক ভাবে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। 'মামা' 'মামা' বলিয়া কত প্রাণের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি কুশলপ্রশ্নাদির পব তাঁহার হাতে রাজর্ষি কৃত একখানা কুষ্ঠী দিয়া বলিলেন "এখানা গোপনে রেখে দাও। আমি এখনই আরাতে চল্‌লুম।" আরাতে তখন চম্পটী ঠাকুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টারী করিতেন। তিনি সেখানে পৌছিয়া স্বপাক কিছু গ্রহণ করিলেন এবং ভুক্তাবশেষ চম্পটীকে গ্রহণ করিতে

আদেশ করিলেন। সেই অমৃততুল্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই চম্পটীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। প্রাণে তাঁহার অপূর্ব্ব এক আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রভু যে সাধারণ মানুষ নন, একথাও প্রাণে প্রাণে তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই চম্পটী ঠাকুর চাকুরী ত্যাগ করিয়া তীব্র বৈরাগ্যভাবের উন্মাদনায় জগতের হিতকল্পে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রভু ১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়া আসিলেন। এযাবৎ কাল তিনি দিগম্বরী দেবীকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেন কিন্তু এবার আসিয়া "হরিবোল" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। দেবী তো 'জগৎ' 'জগৎ' বলিতেই আত্মহারা! প্রভু তখন তাঁহার কাছে বলিতে লাগিলেন "দেখুন্! আপনি সকলের বড়—গোষ্ঠীর মাথা। আপনার কাছে কয়টি কথা বলি। আমি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলাম, এ জন্মেই বা কে, তা বল্‌তে পারি।" ঐ কথা শুনিয়া দিগম্বরী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "বল তো তুমি কে?" তিনি বলিলেন "জন্মে জন্মেই আমি রাজা ছিলাম, এ জন্মেও আমি রাজা; তবে ভোগের রাজা নয়—যোগের রাজা।" আরও বলিতে লাগিলেন—"এ বংশের মধ্যে যার যে ভাবেই মৃত্যু হোক্ না কেন কারো অধোগতি হবে না।"

বৃন্দাবন হইতে তিনি কলিকাতা হইয়া ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কিরূপ ভাব অবস্থা, তাহা "বন্ধু-কথা" নামক গ্রন্থকার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিলাম,—"জগদ্বন্ধু কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে আসিলেন। তিনি এই সময় অতি নিষ্ঠাপরায়ণ কঠোর ব্রহ্মচারী, নবীন তাপসের ন্যায় কলেবর। অধিকাংশ সময় আপাদমস্তক বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া থাকিতেন। কেবল পথ দেখিবার জন্য একটি মাত্র চক্ষু বাহির কবিয়া রাখিতেন। কাহারও সহিত মিশিতেন না বা বেশী কথা বলিতেন না। বেশভূষা সাধারণ রকমের, আড়ম্বরশূন্য। এতদ্দেশে পদার্পণকারী সাধু মহাত্মাদিগকে যেরূপ জটাজুটসমন্বিত, গৈরিক বসন পরিহিত, বিভূতি-ভূষণে ভূষিত ও লোটা কম্বল চিম্‌টাধারী দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহার বসনভূষণ সেরূপ নহে। তিনি ধূনী জ্বালিতেন না, গঞ্জিকা সেবনের ব্যবস্থা দিতেন না বা স্বয়ংও সেবন করিতেন না। সর্ব্বপ্রকাব মাদকদ্রব্য হইতেই সতত দূরে থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহার পরিধানে সাদা ধূতি, গায়ে বোম্বাই চাদর, পদযুগলে রবারের পাতুকা, গলদেশে (জনৈক ভক্তপ্রদত্ত) সুবর্ণতাবে গ্রথিত ছোট রুদ্রাক্ষমালা। মস্তকে ঈষৎ বড় চুল, আঁখি ঢল ঢল, করুণায় ছল্ ছল্, সময় সময় ভাবে বিহ্বল অবস্থা।" বন্ধুকথা—৩৭ পৃষ্ঠা।

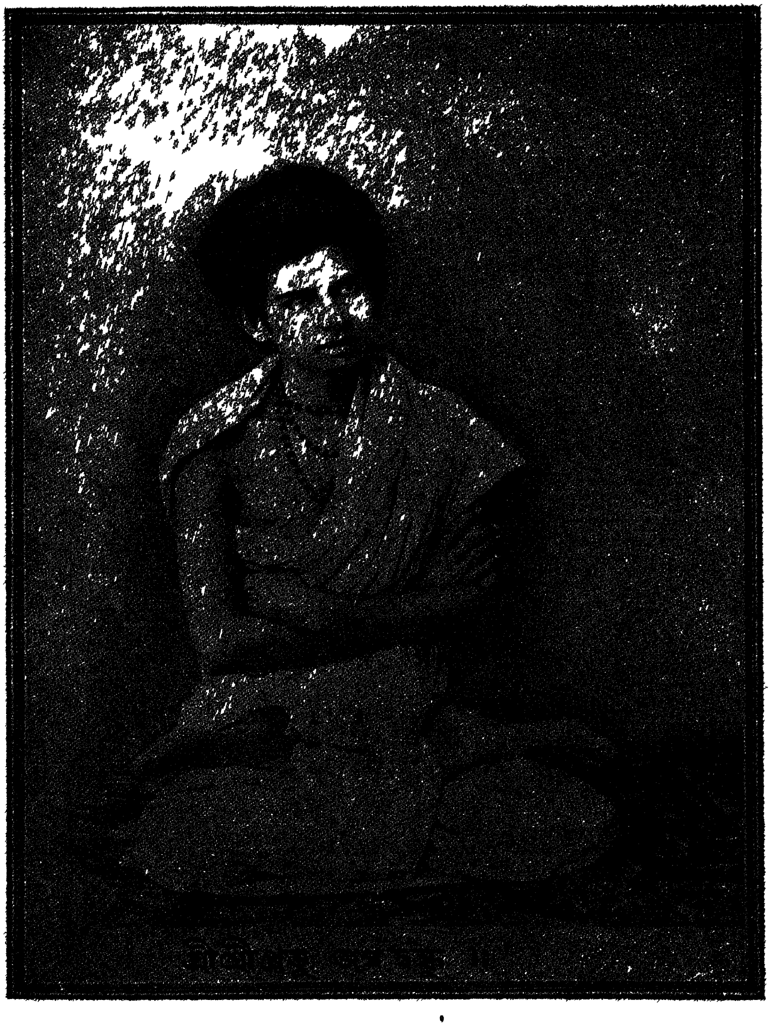
প্রভুর ঐরূপ তীব্র বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া দিগম্বরী দেবী বিশেষ চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া একজন ভক্তবালক সঙ্গে পুনরায় তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন। এই ভক্তটির নাম বকুলাল বিশ্বাস।

ইহার নিবাস বদরপুব গ্রামে। ইতিপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন। প্রভু ইঁহাকে নিরতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উপদেশমত নিয়ম নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যয়নে ব্রতী ছিলেন। প্রভুই তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার আশীর্ব্বাদে তিনি সবজজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও নিজমুখে ইনি প্রায়শঃ বলিয়া থাকেন "আমার যা কিছু শিক্ষা, ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদা লাভ, সে সবই ওঁর অনুগ্রহে।"

কলিকাতা যাইয়া তিনি রামবাগানের ডোম-পল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই ডোম-ভক্ত কাহিনী পরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে। তাঁহার সতর বছরের যে পদ্মাসনাসীন যোগেশ্ববেশ্বর মূর্ত্তিখানি, তাহাও এইবার প্রভুর কলিকাতা অবস্থান কালে লওয়া হয়। প্রথমতঃ তাঁহার বাম-পার্শ্বে বকু বিশ্বাস মহোদয়কে দাঁড় করাইয়া উক্ত ফটোখানি ১৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল ফটোগ্রাফার দ্বারা তোলা হয়। পরে তাঁহাকে পৃথক্ কবিয়া ছোট বড় নানা রকমের ব্লক তৈয়ারী হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে তিনি উক্ত ১২৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসে পাবনা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যদিও এ বৎসর পড়াশুনা আদৌ হয় নাই, তবু এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পড়ায় অপ্রত্যাশিত মনোযোগিতা দর্শন কবিয়া গোলোকমণি দেবীসহ সকলেরই

সপ্তদশ বৎসরের প্রতিমূর্ত্তি



প্রেমাবতার প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর

আনন্দের আর সীমা রহিল না। ক্রমশঃ তিনি টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরীক্ষার ফিয়ের টাকাও জমা দেওয়া হইল।

এনট্রান্স পরীক্ষার আর মাসখানেক বাকী আছে। ইতিমধ্যে তিনি প্রকারান্তরে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ব্যবহারিক পড়াশুনারও ইতি হইল। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহা শত অনুসন্ধানেও আর জানিতে পারা গেল না। পাবনায় তিনি ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক মাসে আসিয়া অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। প্রায় আড়াই বৎসরকাল অধ্যয়ন ব্যপদেশে পাবনায় থাকেন। তৎপর ১২৯৫ সালের মাঘ মাসে তিনি কলিকাতা হইতে নিরুদ্দেশ হন।

নিরুদ্দেশ গোলায় প্রভু।

দিগম্বরী দেবী তাহার নিরুদ্দেশের সংবাদ পাইয়া হা হুতাশ করিতে করিতে পাবনা যাত্রা করিলেন। ষ্টিমারের মধ্যে অভিনব যোগরাজবেশী এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। প্রভু তখন এমন ছদ্মবেশে সাজিয়াছেন যে দেবী তাহাকে তাঁহারই আদরের জগৎ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। মনে মনে সেই মৃগচর্ম্ম, কুশাসন, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "মৃগচর্ম্ম কুশাসন, বোধ হয় ব্রাহ্মণ।" কিন্তু পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিতে করিতে তাঁহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া লইবার জন্য বহু কাতরতা প্রকাশ করিলেন কিন্তু সবই বৃথা হইল। তিনি বলিলেন "আমি কিছুদিন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করবার সংকল্প ক'রেছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

যতশীঘ্র সম্ভব আবার আপনাদের সঙ্গে মি'লব।" অগত্যা দিগম্বরী দেবীর ঐ বাক্যতেই আশ্বস্ত হইতে হইল। তৎপর তিনি বাড়ী ফিরিয়া প্রভুর একখানি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিলেন এবং ঐ মোহন ছবিখানিই তখন হইতে তাঁহার সম্বল হইল।

এই সময় হইতে তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাল সমগ্র ভারত এবং ভারতের বাহিরেও বহুদেশে সুপ্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করেন। একদিন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের রাজপথে তিনি পরিদৃশ্যমান হন। ঐ সুন্দর সুঠাম সুদীর্ঘাকৃতি অপরূপ মানুষটির সম্বন্ধে তৎকালীন ফরাসী সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছিল। আমাদের চম্পটী ঠাকুর উহার কয়েকখানি পত্রিকার কাটিং সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহাতে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া চম্পটী ঠাকুরপ্রমুখ ভক্তগণ ঐরূপ মূর্ত্তি যে প্রভুর ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না, এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। তিনি পরে যখন ভক্তগণের মধ্যে ফিরিয়া আসেন তখন ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিলে প্রভু মাত্র মৃদু মৃদু হাস্য করিতেন। তাঁহার সেই ভুবন ভুলান হাসি দেখিলে ভক্তগণের সকল প্রশ্নই বিস্মরণ হইত!

বৃন্দাবনে প্রভু

প্রায় দেড় বৎসর পর ১২৯৭ সালের জ্যেষ্ঠমাসে প্রভু জয়পুরের মহারাজ ভবনে প্রথম প্রকাশ হন এবং রাজসমাদরে কয়েক মাস অবস্থান করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ঐস্থানে অবস্থিত বৃন্দাবনের সুপ্রাচীন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবা করিতেন। অতঃপর বৃন্দাবনে রাজর্ষি বনমালী রায়ের কুঞ্জে আগমন করেন।

রাজর্ষিবর সুদীর্ঘকাল পরে প্রভুর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর তৎকালীন অভিনব প্রেমবৈরাগ্যমূর্ত্ত নবগৌর-কান্তি দর্শনে তাঁহার মনপ্রাণ জুড়াইয়া গেল। প্রভু তখন আপনার মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ভজনশীল বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রাণমণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে মাঝে মাঝে তিনি জ্ঞানগুধরি, অযোদ্ধাকুঞ্জ, পাথরপুরা, হায়দ্রাবাদকুঞ্জ, কেশীঘাট, লছমীরাণীর কুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেন। সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর শিষ্য জগদীশ বাবাকে প্রায়ই দর্শন দিতেন। উক্ত জগদীশবাবা প্রভুকে দেখিলেই বলিতেন—"প্রভো! আপনি কাছে এলে আমার আর স্মরণ মনন থাকে না। আপনার ভিতরে যেন কি একটা আছে, যাহা আমাদের ভজন ভুলায়ে দেয়।" তিনি ঐ কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন।

বৃন্দাবনে তিনি কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না। সুধী

বৈষ্ণবগণ তাই তাঁহাকে "মৌনীবাবা" বলিয়া ডাকিতেন। মাধবদাস বাবাজীও মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শনের জন্য আসিতেন। রাজর্ষি বনমালী রায়ের তিনি পরম ভক্তির পাত্র ছিলেন। মাধবদাসজী ছিলেন পরম রসিক ভক্ত। প্রভুকে তিনি "ভট্টাচার্য্য মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি তাঁহার সহিত যেরূপ স্বচ্ছন্দভাবে মিশিতেন, তেমন আর অন্যত্র দেখা যাইত না। গোবিন্দ কুণ্ডের মনোহর দাসজীও বহুবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। প্রভু যখন গোবিন্দকুণ্ডে গিয়া বসিতেন, তখন উক্ত বাবাজী মহাশয় তাঁহার কাছে আসিয়া যাহাতে তিনি কথা বলেন, তজ্জন্য নানা প্রশ্ন করিতেন। প্রভু কিন্তু কোন কথাই বলিতেন না, তবে সেই মৃদুমন্দ হাসিমাখা মুখখানি দেখিলেই প্রাণে তাঁহার অভিনব শান্তির উৎস ঝরিত।

বৃন্দাবনে সাধুবৈষ্ণব দেখিলে প্রভু প্রথমেই প্রণাম করিতেন। রাধাকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ডে যাইলে তথাকার জগন্নাথ মন্দিরে অবস্থান করিতেন। ব্রজবাসীরা তাঁহাকে "ঘুংগেটবালে" (ঘোমটাওয়ালী) বলিয়া ডাকিতেন কারণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রায়ই বস্ত্রাচ্ছাদিতে থাকিত। বৃন্দাবনে রাধাবিনোদের তৎকালীন সেবাইত কুন্দন ব্রজবাসীর উপর তাঁহার সেবার ভার অর্পিত ছিল। নিত্যই তিনি প্রভুর জন্য প্রচুর প্রসাদ লইয়া আসিতেন। কিন্তু প্রভু যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া সমস্তই বিতরণ করিয়া দিতেন।

বৃন্দাবনে গাভীগুলি আসিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গলেহন করিত এবং তিনিও মহাসুখে তাহাদের সহিত খেলা করিতেন।

তিনি যখন যেখানেই যাইতেন, সুযোগ হইলে গো-গৃহেই অবস্থান করিতেন। স্বয়ং নিত্য গোময় ভক্ষণ করিতেন এবং অনুগতদের করাইতেন। কেহ কোনরূপ অন্যায় করিলে গোবর, চোনা খাইয়া পবিত্র হইবার উপদেশ দিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীমুখে উচ্চারণ করিতেনঃ—"যেথায় চোনা সেথায় সোনা। যেথায় শুক্ত সেথায় মুক্ত॥" প্রত্যেক পল্লী গৃহস্থের বাড়ীতে যাহাতে গাভী, কৃষ্ণপট, তুলসীবৃক্ষ, খোলকরতাল, নৌকা ও ভক্তিভাগবত গ্রন্থাদি রক্ষিত হয়—ভক্তগণকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন।

গাভীর প্রতি প্রভুর ব্যবহার।

গাভীর সহিত প্রভুর ব্যবহার সম্বন্ধে নানা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে দুই একটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল। পরবর্ত্তীকালে ভক্তবর নবদ্বীপদাসের সহিত একদিন বাকচর হইতে ব্রাহ্মণকান্দা আসিবার কালে কতকগুলি গাভী দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিতেছিল। উহাতে তিনি নবদ্বীপকে বলিলেন—"ছ্যাখ্, গাভীগুলি আমার দিকে কি ভাবে তাকিয়ে আছে? ওরা আমায় খুব ভালোবাসে!" এই বলিয়া গাভীগুলির দিকে চাহিয়া তিনি "গোবিন্দ, গোবিন্দ" উচ্চারণ করা মাত্র উহারা যেন অস্থির ও অধীর হইয়া পড়িল এবং উহাদের চাহনীর ভিতর দিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিল!

ইতিপূর্ব্বে রাজর্ষির গৃহে যখন তিনি অবস্থান করিতে-

ছিলেন, তখন রাজাবাহাদুর কর্তৃক কয়েকজন ভাগবতের বড় বড় পণ্ডিত সেখানে আনীত হন। উঁহাদের মুখে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণে তিনি পরমানন্দে থাকিতেন। ঐ সময় খ্যাতনামা দার্শনিক ভক্ত শ্যামলাল গোস্বামীপাদ রাজর্ষিভবনে পাঠ করিতে আসেন। তিনি পাঠে বসিলে প্রভু অদূরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার পাঠ শুনিতেন। একদিন কয়েকটি গাভী ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর গা চাটিয়া তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিল। পাঠ করিতে করিতে গোস্বামীপাদের দৃষ্টি লতাপুষ্পের মধ্য দিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হইল। ঐ মাধুরীমণ্ডিত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া তিনি উন্মনা হইয়া উঠিলেন। পাঠ অন্তে রাজর্ষির নিকট বাগানের ভিতর কে বসিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য বলিলেন "আমি দেখিলাম, বস্ত্রাবৃত একজন সুন্দর যুবক বসিয়া আছেন ও কয়েকটি গাভী আসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গলেহন করিতেছে। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতেও যেন তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।"

রাজর্ষি প্রভুর পরিচয় দিলে, তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন কিন্তু তিনি স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন "শ্রীমতীর নিষেধ আছে।" প্রভু রাধানাম উচ্চারণ করিতেন না। রাধাকে শ্রীমতী, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বা অমুক প্রভৃতি বলিতেন। চিঠিপত্রে এবং ভক্তদের লিখিতভাবে উপদেশ দিতে গেলেও অধিকাংশস্থলে 'শ্রীমতী' এবং 'শ্রীমতী ভরসা' লিখিতেন।

বৃন্দাবনে তিনি কুসুমসরোবরে শ্যামদাস বাবাজীর কুটীরেও মাঝে মাঝে গিয়া বসিতেন। প্রভুর ইনি বিশেষ ভক্তরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ব্রজকুঞ্জের আর একটি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মা তোত্‌লা নিত্যানন্দ দাস বাবাজীও প্রায়শঃ তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার ভাগ্য পাইতেন। প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে যাইবার পথে ইহার ভজনকুটীরে পদার্পণ করিতেন।

এ যাত্রা প্রভু বৃন্দাবনে কয়েকমাস থাকিবার পর বাংলার দিকে রওনা হইলেন। কলিকাতা, নবদ্বীপ, পাবনা প্রভৃতি স্থানের ভক্তবৃন্দকে দর্শন দিয়া পুনরায় তিনি ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়া আসিলেন। এখন হইতেই তাঁহার পতিতোদ্ধারণ লীলার আমরা বিশেষ পরিচয় অবগত হইব। বর্ত্তমান জগজ্জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা ধর্ম্মের উপদেশও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে পাইব। বৃন্দাবনে প্রভুর ফরিদপুরে অবস্থান করিবার সংকল্প শুনিয়া বান্ধববৈষ্ণবচূড়ামণি শ্যামানন্দ দাস একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি ফরিদপুরে থাক্‌বেন কেন? যেখানে একটি তুলসীসেবা পর্য্যন্ত নাই। আর নানাদিক দিয়াই ফরিদপুর ভজনের অযোগ্য স্থান। আপনাকে আমরা যমুনার তীরে উত্তম একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিব। আপনি পরমানন্দে সেখানে থাকিতে পারিবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু ফরিদপুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"ওরে, যেহেতু ফরিদপুরে একটা তুলসীসেবা নাই সেই হেতু এবার আমাকে ফরিদপুরেই থাক্‌তে হবে। ফরিদপুর পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিত স্থান। কিন্তু জানিস্‌, যদি কোনদিন সমস্ত

পৃথিবী প্রলয়ের জলে ডুবে যায়, সেদিনও ফরিদপুরে হাঁটু জল। ফরিদপুবকে এবার আমি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত কর্‌ব।"

আজ যে আমরা ফরিদপুর সহর ও আশপাশের পল্লীগ্রামগুলিকে অনেকটা রূপান্তরিত দেখিতেছি, ফরিদপুর যে আজ ধর্ম্মচর্চ্চারও অগ্রগণ্য স্থানরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার মূলে আছে প্রভুর কৃপাশক্তি। ফরিদপুরবাসীরা তাঁহার কৃপার পরশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে—সেই ভুবনভুলান মূর্ত্তিখানির দর্শন স্পর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। তাহার মহীয়সী লীলার মহাপীঠরূপে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আজ ফরিদপুরের দিকে নিবদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

তিনি যে প্রায় দেড় বৎসরকাল নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা যেন স্বচক্ষে জীবমানবকুলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য। পরবর্ত্তীকালেও তাঁহার বিভিন্ন স্থানে গতাগতি দেখিলে মনে হইত—অন্তরে তাঁহার কি যেন একটি মহতী পরিকল্পনা আছে। জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য যেন তিনি সদাই ব্যস্ত। তাই যে বয়সে যেরূপভাবে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য মহাপুরুষদের ঐ বয়সের কৃতিপদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার ঐ বয়সে অন্যান্য সাধুমহাজনগণ অনেকেই সাধনযোগানুষ্ঠানে নিরত রহিয়া আত্মমুক্তির পথে মাত্র অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু প্রভুর যেন স্বতন্ত্রভাবে আত্ম বলিতে কিছুই নাই—জীবনিবহ লইয়াই যেন তাহার আত্মাদেহমন গঠিত। জীবের

দুঃখ দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া আকুল! কই, আমরা তো কোনদিন তাঁহাকে গুরুকরণ করিতে দেখিলাম না! কোন সময় উক্ত বিষয়ে একজন ভক্তকে মাত্র বলিয়াছিলেন, "তোদের শ্রীমতী আমাকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়াছেন।" সাধারণ আউল, বাউলাদির মত বৈষ্ণব বেশভূষার পাবিপাট্য বা ফোটাতিলক প্রভৃতিও তিনি অঙ্গীকার করেন নাই। তবে কি তিনি বৈষ্ণব নন? আমাদের ধারণা—ভক্ত বৈষ্ণবভাবই প্রভু জগদ্বন্ধুরূপে মূর্ত্ত হইয়াছেন। কোন সময় তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, **"জগতে যদি একজনও প্রকৃত বৈষ্ণব থাকৃতেন, তাহলে আর আমার আসৃতে হত না।"** বৈষ্ণবতা এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়াই প্রাণমন তাঁহার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

অনন্যসাধারণ ত্যাগবৈরাগ্য, অনুপমশ্রী, অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য, প্রকৃত অহিংসা, পরমপ্রেম, সুদিব্য পবিত্রতা প্রভৃতি প্রভুতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—শুদ্ধসত্ত্বের প্রকট বিগ্রহরূপেই তিনি বিরাজ করিতেছেন। এখন হইতেই আমরা তাঁহাকে জীবদুঃখ নিরাকরণে অভিনবরূপে ব্যস্ততৎপর দেখিতে পাইব। প্রেম মহামানবতাকে বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; সনাতন ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতীয় উন্নতির পথপ্রদর্শকরূপেই যে তিনি শরণ্য হইয়া রহিয়াছেন, ইহাও একদিন আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।

ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভু

(যৌবনোন্মেষে)

১২৯৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রভু যখন নিরুদ্দেশ লীলার পর ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরিয়া আসেন তখন চারিদিকে এক অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া যায়। দিগম্বরী দেবী প্রাণের ভাই জগতের যে আবার দেখা পাইবেন, সে আশায় একপ্রকার জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। প্রভুকে কোলের কাছে পাইয়া তাঁহার প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের রূপলাবণ্য তখন সত্যই অনির্ব্বচনীয় হইয়াছে। এই সময় কুল-বিগ্রহ রাধাগোবিন্দের নিত্য নিয়মিত সেবাপূজাই তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্যরূপে পরিণত হইল। সেবার ছলে প্রভু নানা খেলা খেলিতেন। কখনও বিগ্রহরূপিণী প্যারীর অঙ্গবস্ত্র ও আভরণগুলি গোবিন্দের অঙ্গে পরাইতেন আবার রাধাঅঙ্গে শ্যামের পীতবাস ও শিরে মোহনচূড়া পরাইয়া রাই বামে কৃষ্ণকে বসাইয়া হাসিয়া হাসিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেন।

একদিন দিগম্বরী দেবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু রাধাগোবিন্দের মন্দিরের দিকে যাইতেছেন। অপরাহ্ণ কাল। অদূরেই প্রকাণ্ড আকারের একটি তুলসীতরুর ছায়া পড়িয়াছে। উক্ত ছায়ার উপরে যাহাতে পা না পড়ে, তজ্জন্য তিনি একটু দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু কি

তুলসীর ছায়া ও জ্যোতির কথা

আশ্চর্য্য ! তুলসীর ছায়াটিও অপেক্ষাকৃত প্রসারিত হইয়া তাহার চরণ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইল ! প্রভু তখন হাসিতে হাসিতে অন্য দিক ঘুরিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু তুলসীসতীর ছায়াও সেই দিকে হেলিয়া তাহার চরণোপরি পতিত হইল। দিগম্বরী দেবী এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া জগতকে ছদ্মবেশী দেবতা বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন।

আর একদিন অপরাহ্নকালে দেবীমাতা দেখিতে পাইলেন, "সূর্য্যের কিরণমালা নামিয়া প্রভুর অঙ্গজ্যোতিঃর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং প্রভুর অঙ্গ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব এক জ্যোতিঃর পথ পড়িয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঐ জ্যোতিঃ সবুজবর্ণ ধারণ করিয়া তাহার অঙ্গে মিলিয়া গেল। তাহার মাঝে এইরূপ কত কি অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখা যাইত।

ভক্তগণের আগমন

প্রভুর বাল্যক্রীড়াসঙ্গী প্রতাপ ভৌমিক তাঁহার আগমনের বার্ত্তা পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার মনোবাসনাও তাঁহার পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি তাঁহার গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী এই নূতন নামকরণ করিলেন। গোকুলানন্দ সর্ব্বদা তটস্থভাবে তাহার আদেশ পালনকার্য্যে ব্রতী হইলেন। একে একে আরও অনেক সুকুমারমতি বালক ও যুবক তাহার চরণে শরণাগতি গ্রহণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে কার্ত্তিক নামক একটি ভৃত্য ছিল। প্রভু তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাহার কোথাও যাইবার সময় সে জিনিসপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইত।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন হিন্দুসমাজে অভিজাত অবজাতের ভেদব্যবধান অতি সুস্পষ্ট। প্রভু উচ্চবর্ণের সমাজনায়কদের এই নিছক গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের কোনদিন প্রশ্রয় দেন নাই। যে যত দীন, যে যত কাঙ্গাল, সে-ই তাঁহার ততোধিক কৃপার পরশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণকান্দার চক্রবর্ত্তীবাড়ীখানি ক্রমশঃ সাহা, নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী, বুনা প্রভৃতি সমাজ উপেক্ষিত অবজাত শ্রেণীর ভক্তগণেরই মিলনভূমিতে পরিণত হইল। গোয়ালচামটের গৌরকিশোর সাহা, রামসুন্দর ও রামকুমার মুদী, কেদার শীল প্রভৃতি; বাক্‌চরের গোপাল মিত্র, নেচু সাহা, ক্ষুদীরাম সাহা, মহিম দাস, কোদাই সাহা প্রভৃতি; বদরপুরের কানাই মিত্র, বাদল বিশ্বাস প্রভৃতি—পরাণপুরের জন্মেঞ্জয় প্রামানিক ও আর আর অনেকে তাঁহার একান্ত আনুগত্যে জীবনযাপনে প্রয়াসী হইলেন। ইঁহাদের দ্বারাই প্রথমতঃ তিনি সংকীর্ত্তন প্রচারণ, বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার তথা প্রেম-ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

ফরিদপুর সহরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তখন ন্যাড়া-নেড়ী, আউলবাউল, সহজিয়া, দরবেশী প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মের উপধর্ম্মাচারীদের প্রাবল্য ছিল। গ্রামে গ্রামে তখন গাঁজার কল্‌কে ও ত্রিনাথের মেলার ধূমধাম প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। সত্যসনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে সুবিশুদ্ধভাব, তাহা গ্রামদেশগুলি হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় প্রভু সহজ সরল ভাষায় প্রেমের ঠাকুর নিতাই গৌরাঙ্গ ও রাধা-

কৃষ্ণের সুমধুর লীলারূপগুণের কথা বর্ণনা করতঃ অভিনব ছন্দে যে কীর্ত্তনের গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ঐ গানগুলি যাহাতে গ্রামে গ্রামে সংকীর্ত্তিত হয়, সে ব্যবস্থা করিতেও উদ্যোগী হইলেন।

পল্লীসংগঠনের এক অভিনব আদর্শ তাঁহার কার্য্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। যাহাতে বাংলার নিয্যাতীত নিপীড়িত অবজাত শ্রেণীভুক্ত পল্লীজনগণ সদুপায়ে মোটা ভাত-কাপড়ের জোগাড় করিয়া সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও হরিনামের আশ্রয়ে জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে পারে, সেইভাবেই তিনি তাঁহার পরম-পাবনী লীলার সূত্রপাত করিলেন। গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়া উহার মধুমন্দাকিনীধারায় ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণ-গুলিকে স্নিগ্ধশীতল করিতে লাগিলেন। বিরাট, তুরীয়, অসীম, অনন্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্মের উপাসনা বিধান না দিয়া ভগবান যে সাকার, শান্ত, সুন্দর, আমাদের দুঃখের দরদী, প্রাণের জন, ভালবাসার বস্তু এই ধারণাই অনুগত আশ্রিতদের অন্তরে বদ্ধমুল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরূপে, গৌররূপে কিরূপে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিয়া প্রেমের খেলা খেলিয়াছিলেন, পতিত পাপীকুলকে রাতুল চরণযুগলে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পাবনমধুর লীলাকথা শুনাইয়া তিনি সরলপ্রাণ দীন দরিদ্রের হৃদয়ে অনুপম শান্তির উৎস ঝরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রেমমধুর মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ও বীণাবিনিন্দিত সুধাকণ্ঠের উপদেশাবলী শ্রবণে সকলেরই প্রাণ ভক্তিরসে সরস হইয়া

উঠিত। তাঁহার সঙ্গসুখের আস্বাদন পাইয়া ভক্তগণের সাংসারিক তাপ জ্বালা ও অশান্তি উদ্বেগ দূর হইয়া যাইত। সাধারণতঃ তিনি অনুগতদের মাথা ন্যাড়া করাইয়া বৈরাগী সাজাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং সংসারে থাকিয়া কি করিয়া পবিত্র জীবন বহন করিতে হয়—সংসারই কিরূপে সুখের আকর হইয়া ওঠে, সেইরূপই উপদেশ দান করিতেন।

তিনি স্বচরণে শরণগ্রহনেচ্ছুদের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নখদর্পণে দেখিতে পাইয়া প্রকৃতির অনুকূল উপদেশ দান করিতেন। কানে মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিবার প্রবৃত্তি কখনই যে তাহার অন্তরে জাগরূক হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। সত্যিকার উদারতা, মহাপ্রাণতা ও অসাম্প্রদায়িক ভাব তাহার লোকোত্তর চরিত্রের বিভূষণ ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি সাধু, কি অসাধু—সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। কুশল ফকির, বুধাই ফকির, মুন্সী আমেদ প্রভৃতি মুসলমানগণকেও তিনি সত্যধর্ম্মে জয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীখানি অহর্নিশি লোকে লোকারণ্য থাকিত। ক্রমশঃ বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতেও বহু গণ্যমান্য সুশিক্ষিত ধনী, জমিদার, ভক্ত, বৈষ্ণব ও নানাশ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসীর দলও মাত্র তাঁহার এক পলকমাত্র দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহ দর্শন চাহিলেই তিনি দর্শন পাইতেন না। প্রায় সময়েই দেখা যাইত,

ধনীমানীরা বহু কাকুতি মিনতি দ্বারাও তাহার সুদুর্ল্লভ দর্শনসুখের অধিকারী হইতেছেন না, পক্ষান্তরে দীনদরিদ্র কাঙালদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত আপনভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। অমানুষী ঐ চরিত্রের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

বাকচরের গোপাল মিত্র মহাশয় একজন উত্তম কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব দল ছিল। ফরিদপুর চৌধুরী জমিদার বাড়ীতে ও রথখোলায় তিনি মধ্যে মধ্যে দলবলসহ কীর্ত্তন করিতে আসিতেন। কীর্ত্তনে যাইবার সময়ই একদিন তিনি পথিমধ্যে দর্শন দিয়া তাঁহার প্রাণমন কাড়িয়া লইলেন। তাহার পর হইতে তিনি ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। প্রভুরচিত কীর্ত্তনগান প্রচারকার্য্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম ব্রতী হইলেন। প্রভুর রচনার বৈশিষ্ট্য ও প্রাণমাতান ভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রথম দিন প্রভু তাঁহাকে "এস এস নবদ্বীপ রায়, দীনজন ডাক্‌ছে হে তোমায়। আমি ভব-ঘোরে ঘুরে ঘুরে আচ্ছন্ন মোহ মায়ায়॥" "ভজ নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ। যদি যাও গোকুল বৃন্দাবন। ও সে নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরমধন॥" "ঐ শ্যামরায়। ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়ায়ে কদম্বতলায় রে—" প্রভৃতি কয়েকটি গান লিখিয়া দিলেন। মিত্র মহাশয় ঐ গান কয়টি গ্রামে গ্রামে গাহিয়া প্রচার করেন। অতঃপর তিনি ঊনপঞ্চাশজন গায়ক লইয়া নূতন একটি কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বাকচরে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকেন।

উক্ত ১২৯৭ সালের কার্ত্তিকমাসে প্রভু ভক্তগণসহ ব্রাহ্মণকান্দায় তুমুল আনন্দকীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। মাস অন্তে চৌদ্দমাদলে নগরকীর্ত্তন হইবে এরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে এদেশে আর ঐরূপ নগরকীর্ত্তনের কথা শোনা যায় নাই। ঘোষণার পূর্ব্বেই প্রভু কলিকাতা হইতে নগরকীর্ত্তনের নানাবিধ সাজসরঞ্জাম, যথা—বড় পাখা, বড় ঘড়ি, রাজছত্র, ঝাড়, বড় করতাল, বিউগ্‌ল্, কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন।

১লা অগ্রাহায়ণ তারিখে প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন মঙ্গলাচরণে নগরে বহির্গত হইলেন। যশোহর রোড ধরিয়া উক্ত সংকীর্ত্তনবাহিনী সহরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তিনি জিলা স্কুলের সমীপবর্ত্তী হইয়া উক্ত বিদ্যালয় পরিক্রমা করিতে আদেশ করিলেন। প্রধান শিক্ষক ভুবনবাবু ও অন্যান্য ছাত্র শিক্ষকমণ্ডলী একদৃষ্টে তাহার সেই ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। স্কুল পরিক্রমার পর তিনি সংকীর্ত্তনরঙ্গে সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিলেন। কীর্ত্তনের বিপুল সাড়ায় এবং প্রভু আজ নগরে বাহির হইয়াছেন শুনিয়া দলে দলে নরনারী ঐ অপরূপ রূপরাশি নিরীক্ষণের আশায় পাগলপারা হইয়া ছুটিতে লাগিল।

সেদিন তিনি ভক্তমণ্ডলীকে সাতটি দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন গান গাহিতে দিয়াছিলেন। প্রতিদলে দুইখানি মৃদঙ্গ ও অগণিত করতালাদি ছিল। ক্ষণে ক্ষণে তিনি প্রতিদলের মধ্যেই কীর্ত্তনেশ্বররূপে বিরাজ করিতেছিলেন।

উক্ত কীর্ত্তনের দলগুলি প্রভুব নির্দ্দেশমত বর্ত্তমান ফবিদপুব বাজেন্দ্র কলেজেব নিকটস্থ বুনাপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইল। তিনিও পতিতপাবন লীলাব অন্যতম একটি দৃশ্যপট উন্মোচন কবিলেন। উক্ত বুনা বা বাগ্দাজাতিব পূর্ব্বেতিহাস সম্বন্ধে ১৩২২ সালেব শ্রাবণ মাসেব "ভাবতবর্ষ" পত্রিকায "জগদ্বন্ধু" শীর্ষক প্রবন্ধে * সুসাহিত্যিক বসিকলাল বায় মহোদয লিখিয়াছিলেন, "যে সকল কোল, সাঁওতাল কুলি বাস্তা বাঁধিতে আসিয়া

* উক্ত প্রবন্ধে প্রভু কর্তৃক বুনাজাতিব পবিবর্ত্তন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল। যথা—"বুনাবাড়ী অশ্লীল নাচগান, ব্যভিচাব ও সুবাপানেব জন্য বিখ্যাত ছিল। হঠাৎ একদিন নীবব সাধক জগদ্বন্ধু ললিত বুনাদেব বাড়ীব উপব দিযা চলিযা গেলেন। সে ব্রহ্মচর্য্যেব অদ্ভুত তেজে তাহাবা বিস্মিত হইল, সে অপরূপ মোহনমূর্ত্তি দেখিযা তাহাদেব সবল প্রাণ মোহিত হইল। ফবিদপুবেব অনাচাবী বুনা শুদ্ধাচাবী হইযা হবিনাম গ্রহণ কবিল।" ইহাব পব প্রভু সম্বন্ধে লিখিত উক্ত প্রবন্ধেব কিছু অংশও আমবা উদ্ধৃত না কবিযা পাবিলাম না। যথা—"জগদ্বন্ধু বক্তৃতা কবেন না, মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা বিতবণ কবিযা মত প্রচাব কবেন না। তিনি ভেল্কি জানেন না, যাদু জানেন না, ভবিষ্যৎ গণিযা অদৃষ্ট পবীক্ষা কবেন না এবং তুক্ তাক্ তন্ত্র মন্ত্র ঔষধকবচেব ভাণ কবেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহাব ক্ষুদ্র আশ্রম (ফবিদপুব শ্রীঅঙ্গন) লোকে লোকাবণ্য কেন? এ বহস্য কে বুঝাইযা দিবে? তিনি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। তাঁহাব ত্যাগ আছে, সাধনা আছে, সুকৃতি আছে জীবন আছে। তাই তিনি নীবব হইযাও মুখব, নিষ্ক্রিয হইযাও কর্ম্মশীল, মৌনী হইযাও প্রচাবক। আমবা আমাদের সমাজের কল্যানেব জন্য সংসাবে শুষ্ক বাক্যেব আববণে প্রাণহীন চপলতা

যশোহর ও ফরিদপুরে বসবাস করিতেছে, তাহারা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ স্থানীয় লোকের নিকট বুনা নামে পরিচিত।” আরও শ্রুত আছি, নীল কুঠীয়াল সাহেবদের দ্বারাও অনেক কোল, ভিল, সাঁওতাল জাতীয় নরনারী নীলচাষের কাজ চালাইবার জন্য বাংলার বিভিন্ন কুঠিতে আনীত হইয়াছিল।

ফরিদপুর সহরে শতাধিক বর্ষ যাবৎ বুনা বা বাগ্‌দীরা বসবাস করিতেছে। উহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা প্রণালী ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ ছিল। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসব্যাপী মনসাপূজার ছলে উহারা নানারূপ ব্যাভিচারদুষ্ট প্রমোদউৎসবে মত্ত থাকিত। মদ্যপানাদি নানারূপ কুক্রিয়াতেও উহারা অভ্যস্ত ছিল। ঐ সময় মাননীয় হার্টবার্ট সাহেব ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি উহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সংকল্প করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী ফরিদপুরের তৎকালীন পাদ্‌রী মিঃ মিডিসাহেব নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া উহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করেন। এমন কি, উক্তকার্য্যের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছিল।

দেখিতে চাই না—জগদ্বন্ধুর ন্যায় নীরব সাধনাপূত সন্ন্যাসজীবন চাই, যেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারি।”.........

“আমাদের বহু পুণ্যের ফলে দেশের, সমাজের, সাধনার ও শিক্ষার যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ও সাধুতা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হইয়া কলুষরাশি ধ্বংস করিতে আগমন করেন। ইঁহারা দেউটির ন্যায় অমানিশার অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোককেন্দ্র।”

—ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪০।

ইত্যবসরেই প্রভু সংকীর্ত্তনরঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের মত বুনাপাড়ায় আসিয়া উদিত হইলেন। উহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তুমুল আনন্দকীর্ত্তন চলিল।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে মধ্যে মধ্যে একটি প্রাণমাতান সৌরভ বাহির হইত। উহা আতর, এসেন্স, গোলাপ প্রভৃতির সুবাস অপেক্ষা সম্পূর্ণ এক নূতন রকমের এবং প্রাণাকর্ষী ছিল। আজ তিনি শ্রীঅঙ্গগন্ধও ছড়াইয়া দিলেন। বুনাদের সর্দ্দার বা

বুনাজাতির পরিবর্ত্তন

নেতৃস্থানীয় ছিল রজনী পাশা। তন্ত্রোক্ত কৌলসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সে অনেক বিভূতি সিদ্ধাই লাভ করিয়াছিল। প্রভু তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিলেন। ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখিয়াই বাগ্দীনেতা রজনী মুগ্ধ হইয়া গেল। পাড়ার সমগ্র নরনারী প্রাণদেবতাবোধে প্রভুর চরণে শরণ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ঐ দিবস তিনি উহাদের সঙ্গে কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না। কিছুক্ষণ পর কীর্ত্তন লইয়া ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়া গেলেন। এদিকে প্রভুর কৃপার পরশ পাইয়া উক্ত বুনাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ভাব দূরীভূত হইয়া গেল।

ইহার কয়েকদিন পরে প্রভু রজনীকে ব্রাহ্মণকান্দা ডাকাইয়া ভুবনমঙ্গল হরিনামে নির্ভরই যে জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট সোপান, এইরূপ উপদেশ দিতে থাকেন। ভগবতী দুর্গা ও কালিকাদেবীর চরণে যে কৃষ্ণভক্তি কামনা করিতে হয়, ইহাও শিখাইয়া দেন।

এই রজনী এতই মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে তিনি

এক দেশের মানুষ অন্যদেশে পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। পরে কোন দুর্বৃত্ত প্রভুর কীর্ত্তনাদিতে বিঘ্ন জন্মাইলে রজনী তাঁহাকে বলেন, "আপনার আদেশ পাইলে আমি রাত্রের মধ্যে উহাকে বহু দূরদেশে চালান দিতে পারি।" তিনি একথা শুনিয়া সস্নেহে তাঁহাকে জানান, "ঐসব করিতে নাই। উহাতে পরমার্থের ক্ষতি হয়।''

ইহার কিছুদিন পর এক গভীর নিশীথে রজনী যখন গোবিন্দপুরের শ্মশানে সাধনে ব্রতী ছিলেন, তখন প্রভু অলক্ষিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি কি মন্ত্র জপ করিতেছেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় রজনী যন্ত্রচালিত পুতুলের মত স্বীয় ইষ্টমন্ত্রের আদ্যক্ষর উচ্চারণ করামাত্র প্রভু এক নিঃশ্বাসে তাঁহার সমুদয় শক্তি হরণ করিয়া লইলেন। রজনী তৎক্ষণাৎ বলহীনের মত পড়িয়া গেলেন এবং "হায় ঠাকুর, কর্‌লে কি!" বলিয়া হা-হুতাশ আরম্ভ করিলেন। প্রভু তখন তাঁহাকে সান্ত্বনার ছলে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার অকল্যান করিতে আসেন নাই। ইহার পর, প্রভুর আদেশে রজনী বৈষ্ণব বেশভূষা গ্রহণ পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তনের অন্যতম সেনাপতিরূপে পরিণত হইলেন। তিনি তাঁহার "হরিদাস মোহন্ত'' এই নূতন নাম দিলেন। প্রভুর কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই হরিদাস একজন পদকীর্ত্তনীয়ারূপে পরিণত হইয়া নানা স্থানে কীর্ত্তন প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন মোহন্তও প্রসিদ্ধ একজন কীর্ত্তনীয়া।

প্রভুর কৃপাদীক্ষা লাভের পর হইতেই বুনাজাতির ভিতর

অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিল। উহাদের সকলকেই তিনি "মোহন্ত" উপাধি দিলেন। উহাদের সমাজ হইতেও ক্রমশঃ কুৎসিত ভাবগুলি লুপ্ত হইতে লাগিল। প্রভুকেই একমাত্র উপাস্য দেবতাবোধে ঐ রাতুল চরণে সগোষ্ঠী উহারা আত্মসমর্পণ করিল। অসভ্য অনার্য্য বুনাজাতির এইরূপ আদর্শ হিন্দু-জাতীয়তায় উন্নয়ন দেখিয়া তাঁহার অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। প্রভু কর্ত্তৃক বুনাজাতির এই পরিবর্ত্তনের কথা তৎকালীন এদেশীয় সাময়িক পত্রাদিতে এবং "আব্কারী" নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্রিকাতেও সবিশেষ আলোচিত হইয়াছিল।

মোহন্ত সম্প্রদায়ের হরিনামে মাতোয়ারাভাব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহাদের ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত মৃদঙ্গবাদনে ও কীর্ত্তনে বিশেষ পারদর্শী। বুনাজাতির পরিবর্ত্তনের সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে প্রভুর দর্শনের জন্য নানাশ্রেণীর নরনারীর সমাগম হইতে থাকে। তিনিও অহিংসা, সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং হরিনামের বিমল আদর্শে স্বদেশ ও স্বজাতিকে নূতন করিয়া গড়িতে লাগিলেন।

বাকচরে প্রভু

প্রভু বাকচরের গোপাল মিত্র প্রমুখ ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে নিবারণ মিত্রকে সঙ্গে করিয়া উক্ত গ্রামস্থ সদর রাস্তাসংলগ্ন কালীমন্দিরে উপস্থিত হন। তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা পাইয়া মিত্র মহাশয় ও অনান্য ভক্তগণ ছুটিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে উলুধ্বনি, হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল ও করতালের রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। আনন্দোৎফুল্ল ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

এই বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি মহিম দাসের বাড়ীতে যান। এখানেও দলে দলে নরনারী তাঁহার দর্শনের আশায় সমাগত হইত। বাকচর প্রান্তবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটিকে তিনি কাবেরী আখ্যা দিয়াছেন। মহিমচন্দ্রের লক্ষ্মী নাম্নী একটি গাভী ছিল। যখনই প্রভু সদলবলে কীর্ত্তন করিতেন, তখনই গাভীটির চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রুমোচন হইত। একদিন কীর্ত্তনের মধ্যে অকস্মাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

প্রভুর আদেশে অঙ্গন প্রাঙ্গণে তাহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। বর্ত্তমানে এই সমাধি একটি দর্শনীয় স্থানরূপে পরিণত

হইয়াছে। এই বাড়ীর উপরেই ১৩০০ সালের চৈত্রমাসে বারুণী-স্নানের দিন ভক্তবর মদন সাহা মহাশয় কীর্ত্তনের মধ্যে দেহরক্ষা করেন। উক্ত দিবস মোহন্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "কবে রাধার দয়া হবে, যাব বৃন্দাবনে রে" এই গানটি গীত হইতেছিল। পরম ভাগ্যবান সাহাজী নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তনের মধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন এবং "আহা কি মধুবর্ষণ হচ্চে"—"আহা কি মধুবর্ষণ হচ্চে"—বলিতে বলিতেই চিরসমাধি প্রাপ্ত হন।

নেচুসা ওরফে কৃষ্ণকুমার

বাকচরের নেচু সা একজন নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। প্রভু ইহাকে কৃষ্ণকুমার বলিয়া ডাকিতেন। নিত্য উষাকালে ইনি করতাল কীর্ত্তনে ভ্রমণ করিতেন। ইনি একখানির অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন। ফলে প্রত্যহ বহুসময় ইহাকে আর্দ্রবস্ত্রে থাকিতে হইত। কিন্তু প্রভুর কৃপায় কখনও তিনি অসুস্থ হইতেন না। গৃহী হইলেও তিনি কামিনীকাঞ্চনে বীতস্পৃহ ছিলেন। একখানি খাতায় প্রভু ইহাকে নানা উপদেশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অপত্য শশধর সাহা বাকচরের বর্ত্তমান ভক্তগোষ্ঠীর অন্যতম।

বাকচর শ্রীঅঙ্গন

১৩০১ সালে বাকচরে একটি শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রভু বাকচর আসিলে শ্রীঅঙ্গনেই থাকিতেন। সাধারণতঃ তিনি ১২৯৭ হইতে ১৩০৭ সাল পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিবৎসর আষাঢ় হইতে আশ্বিন অর্থাৎ সমগ্র বর্ষাকাল এখানে অবস্থান করিতেন। তখন পাঁচুরিয়ার পরে কোন রেল ষ্টেশন ছিল না।

বাকচর হইতে কলিকাতা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যাইবার সময় ভক্তগণ তাঁহাকে কেরোসিনের বড় বাক্স বা দোলায় করিয়া ষ্টেশনে পোঁছাইয়া দিয়া আসিত। ভক্তদের কাঁধে চড়িয়া তিনি মধ্যে মধ্যে এমন ভারী হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহাকে বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। আবার কখনও বা তিনি অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যাইতেন।

বন্ধু সাহার কথা

বাক্‌চরের আর একটি ভক্তের নাম বন্ধুবিহারী সাহা। প্রভু বাকচর শ্রীঅঙ্গনে অবস্থানকালে ইনি অনেক সময় প্রহরীর কার্য্য করিতেন এবং সদাসর্ব্বদা প্রভুর আদেশপালনে ব্রতী ছিলেন। ইঁহার দ্বারে তিনি অনেক দর্শন প্রার্থীকে বলিয়া দিতেন, "ওর এখনও সময় হয় নাই।" "ওর এখন দর্শন হবে না।" "ওকে দর্শন দেওয়া শ্রীমতীর নিষেধ আছে" ইত্যাদি। আবার কোন কোন আগন্তুককে "দুদিন পরে দর্শন পাবে।" "পাঁচদিন পরে দশন পাবে—" এইরূপ আশ্বাসদানে বিদায় করিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় গেলে তাহাদের ভাগ্যে দর্শনলাভ ঘটিত। কিন্তু দর্শনাদি দিলেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিত। কাহা-কেও বা একখানি মাত্র হস্ত, কাহাকেও বা হস্তের একটি অঙ্গুলিমাত্র দেখাইতেন। ভক্তগণ তাঁহার যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন পাইলেই কৃতার্থ হইতেন এবং 'এমন রূপ কখনও দেখি নাই' বলিয়া উল্লসিত হইতেন। ভক্তিবিশ্বাস অনুযায়ী নানাভক্ত তাঁহাকে নানারূপে দর্শন পাইয়াছেন। একদিন গোপালপুরের যাদবচন্দ্র গোস্বামী আসিয়া বন্ধুবিহারীকে

বলিলেন, "আমি প্রভুর দর্শন চাই। তুমি গিয়ে তাঁকে খবর দাও।" ভক্তবর তদনুযায়ী গোস্বামীপাদের প্রার্থনা জানাইলে প্রভু বলিলেন,' সেও মানুষ,আমিও মানুষ। সে আমায় দর্শন ক'রে কি করবে" এই বলিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন না। বংশাভিমানী, পদাভিমানী প্রায়ই প্রভুর দর্শনে আসিয়া বিফল মনোরথ হইতেন ; পক্ষান্তরে যাহারা পতিত, পাপী, আর্ত্ত, কাঙ্গাল তাহাদেব তিনি অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছায় দর্শন দিতেন।

১৩০৯ সালে মহামৌনভাব গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে একদিন প্রভু অধিকরাত্রে বন্ধুর সহিত বাকচর হইতে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসিবার সময় অনেক বিষয় জানাইয়াছিলেন। ঐদিন ইহাও বলেন, "আর আমার কথা পাবি না।" ঐদিনকার বিবিধ বাক্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা -"এবার ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি, ডুরি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। যখন ডুরি ধ'রে টান দেব, তখন প্রত্যেককেই আমার কাছে আস্‌তে হবে। আমি এই ত্রিশ বছর ঘরে ঘরে এত সেধে কেঁদে বেড়ালেম্ কিন্তু কেউ আমার কথা শুন্‌লো না। হরিনাম কর্‌লো না। তোরাও আমার কথা রাখ্‌লি না। দেখ্‌বি, সময়ে এমন দিন আস্‌বে, যেদিন সকলে নাকের জলে চোখের জলে এক হ'য়ে যাবে। তখন দায় ঠেকে আমার শরণ নেবে। মনে রাখিস, কেউ আমার হাত এড়াতে পার্‌বে না।"

বাকচরের নানাকথা।

প্রভুর হাবভাব চালচলন জীববুদ্ধির অতীত ছিল। বাকচরের অনেক দরিদ্র গৃহস্থ ভক্ত তাঁহার অনুগ্রহে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের

সঙ্গে হরিনাম ধর্ম্ম আচরণ করিতেন। বাকচরের ভক্ত বালকদের লইয়া প্রভু রাখালী খেলা খেলিতেন। রাখালবেশে উহাদের সাজাইবার জন্য নানারকমের পোযাক পরিচ্ছদ আনিয়াছিলেন। স্বহস্তে তিনি ছোট ছোট বালকদের সাজাইতেন এবং উহাদের লইয়া পল্লীপথে কীর্ত্তন ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত হইতেন। এখানে ছোটদল ও বড়দল নামক দুইটি কীর্ত্তন সম্প্রদায় ছিল। উহাদের লইয়া তিনি কয়েকবার নবদ্বীপ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। বাকচর প্রান্তবাহিনা কাবেরীতে তিনি জলক্রীড়া করিতেন। কখনও এক ডুব দিয়া তিনি ক্রোশাধিক দূরে স্থিত পরাণপুরের ঘাটে চলিয়া যাইতেন। ভক্তগণ প্রভুর নানা অলৌকিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ঐ নদীর জলে সময় সময় তাঁহাকে পদ্মাসনেও ভাসমান দেখা যাইত।

ভক্তবর কোদাই সা

বাকচরের আর একটি ভক্তের নাম কোদাই সা। প্রভু ব্যতীত ইনি আর কিছুই জানিতেন না। প্রভুরচিত কীর্ত্তন গানগুলি ইহার কণ্ঠে বড়ই মধুর শুনাইত। একদিন ইনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তখন বৃদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ প্রভুর মন্দির দরজায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রভুর দীনবৎসলতায় ও প্রভুত্বে ঈর্ষাকাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ কুপিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, "জগৎ, বিষয়টি কি? জগৎ, বিষয়টি কি?" অনেকক্ষণ পরে প্রভু ঐ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলিয়াছিলেন, **"বিষয় আর কিছুই নহে, দুটী অক্ষর মাত্র—হ আর রি।"**

প্রভুর বাকচর শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান কালে চারুচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি যশোহর নড়াইল ষ্টেটের অন্তর্গত খলিলপুর কাছারীর নায়েব ছিলেন। ইনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রভুকে তিনি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে আসিয়াও সকলকাম হন নাই। একবার তিনি কলিকাতা হইতে বহু প্রকারের ফলমূল আনাইয়া ঐগুলি একখানি ডালায় সাজাইয়া তাঁহাকে উপহার দেন এবং যাহাতে তিনি উহা গ্রহণ করেন, সেরূপ অনুরোধ জানাইতে থাকেন। কিন্তু প্রভু তাঁহার সমক্ষেই উক্ত দ্রব্যগুলি সমাগত বালকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন এবং দর্শন সম্বন্ধে বলেন "এ জন্মে ওর দর্শন হবে না।"

চারু ঘোষের কথা

প্রভুর কথায় নায়েব মহাশয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তৎপর হইতে বাকচরবাসীদের উপর কঠোর নির্য্যাতন চালাইতে থাকেন। প্রপীড়িত গ্রামবাসীরা উক্ত অত্যাচারী নায়েবকে নানারূপ অভিশাপ দিতেন। উহাতে প্রভু বলিতেন, "ওকে তোমরা আর অভিশাপ দিয়ে বিপদগ্রস্ত করো না। ওর কৃতকর্ম্মের ফল দেখেই মানুষ শিউরে উঠ্‌বে।"

ইহার অল্পদিন পরেই উক্ত নায়েব মহাশয় ফরিদপুর জিলার নমঃশূদ্র প্রধান পরগণা তেলেহাটীতে বদলী হইয়া যান। সেখানেও তাঁহার অত্যাচার উৎপীড়নে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। একদিন বলরাম সরকার নামক এক নমঃশূদ্র মাতব্বরের সহিত তাঁহার কিছু বচসা হয়। উহাতে নায়েব মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দ্বারা জোর করিয়া কুঠারযোগে কয়েকখানি কাঠ চিড়া-

ইয়া লন। ইহার ফলে ঐ মাতব্বরের পুত্রগণ এবং গ্রামবাসীরা নায়েবের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া ওঠে এবং বহুলোক মিলিয়া একদিন পথিমধ্যে তাঁহাকে কুড়লের দ্বারা নির্ম্মমভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া যমসদনে প্রেরণ করে।

উক্ত চারু ঘোষই পরজন্মে বাকচরের এক নমঃশূদ্রের ঘরে জন্মধারণ করেন। তাঁহার নাম রাখা হইল গোকুল। অত্যল্প বয়স হইতেই সে প্রভুর আঙ্গিনায় গিয়া ব্রহ্মচারীভাবে অবস্থান করিতে থাকে। শ্রীঅঙ্গন সেবাইত শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাহাকে 'অঙ্গন-তুলাল' বলিয়া ডাকিতেন। অনেক সময় সে প্রকাশ করিত, "পূর্ব্বজন্মে আমি চারু ঘোষ নায়েব ছিলাম।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের বক্ষদেশ দেখাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার বক্ষে ঠিক কুড়লের আঘাতের অনুরূপ একটি চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত বালক ব্রহ্মচারীটি দেহরক্ষা করিয়াছে।

আর একটী ভক্ত কাহিনী বলিয়াই আমরা বাকচর প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। তাঁহার নাম হরিচরণ আচার্য্য। তিনি

মধুমঙ্গল হরিচরণ আচার্য্য

কোকিলকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে আদর করিয়া 'মধুমঙ্গল' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি একদিন ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভুর চরণতলে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি বহু বিচিত্র চিহ্ন দর্শন করেন। সারাজীবন ভরিয়া ইনি প্রভুরচিত কীর্ত্তন প্রচার করিয়া অল্পদিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণকান্দায় প্রভু

(বিশেষ পরিচয়)

প্রভু যখন পূর্ব্ববঙ্গের এই ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থান করিতেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কথাগাথা লইয়া সুধীসজ্জন সমাজে বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কিরূপে কোথা হইতে উহার সূত্রপাত হয়, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। ব্রাহ্মণকান্দায় তিনি স্বীয় অনিন্দ্যসুন্দর রূপকান্তি লইয়া অধিকাংশ সময় গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতেন। বাকচর, বদরপুর, গোয়ালচামট, ফরিদপুর সহর, মোহন্তপাড়া, শোভারামপুর, টেপাখোলা প্রভৃতি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের শত শত নরনারী নিত্য দর্শন লোলুপচিত্তে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। কিন্তু ক্বচিৎ কেহ কেহ মাত্র ঐ অপরূপ রূপরাশি নিরীক্ষণ করিবার ভাগ্য পাইত। প্রভুর আদেশ উপদেশ পাইবার জন্যও অনেকে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেন। এক্ষেত্রেও কদাচিৎ কেহ কেহ শ্রীমুখের দুই-একটি কথা শুনিতে পাইতেন। কেহ কেহ বা শ্রীহস্ত লিখিত দুই-চারিটি উপদেশ পাইয়া ধন্য হইতেন। কৃপানুগৃহীত একান্ত ভক্তগণ ছাড়া সচরাচর কাহাকেও তিনি মৌখিক উপদেশ দান করিতেন না। বিশেষতঃ কথা অপেক্ষা কার্য্য, উপদেশ দান অপেক্ষা স্বকীয় আচরণই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। অনুগত ভক্তগণকে প্রায়ই তিনি এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেন, "তোরা আমার দিকে তাকাস্ নে। তোদের পাপ

চক্ষুর দৃষ্টি আমার অঙ্গে কাঁটার মত বিদ্ধ হয়।” প্রভুর এইরূপ নিষেধ অনুবর্ত্তিগণ পালন করিবার চেষ্টা পাইলেও অনেক সময় ঐ রূপসুধাপানের লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

মিডিয়াম ও প্রভুর প্রথম প্রকাশ

এইরূপে প্রভুর ব্রাহ্মণকান্দা অবস্থানকালে ১২৯৮ সালে হুগ্‌লী নগরীতে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কলিকাতায় তখন থিওসফিষ্টদের প্রবল প্রতাপ ছিল। বেদান্ত ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মনিষ্ঠাবতী এনি বেশান্ত মহোদয়া উক্ত সমিতির মুখপাত্রী ছিলেন। থিওসফিষ্টগণ তখন কলিকাতার বিভিন্নস্থানে সমবেত হইয়া কোন পরলোকগত আত্মাকে মিডিয়াম প্রক্রিয়াদ্বারা পবিত্র আধারবিশেষে আবিষ্ট করাইয়া তাহার মুখে পরলোক রহস্য অবগত হইতেন। অনেক সময় ধর্ম্মপ্রাণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিসকলও উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন কোন সাধু মহাত্মার পরলোকগত আত্মার মুখে নানারূপ ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিতেন।

অন্নদাচরণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি তৎকালে হুগলীর সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার বাসাতেও মধ্যে মধ্যে মিডিয়ামের অনুষ্ঠান হইত। তিনি পরম গৌরভক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে যে আবার মহাপ্রভুর অবতারণের সম্ভাবনা আছে, অনেক সময় তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে এইরূপ অনুভূতির আলোক-রশ্মিপাত হইত। তাঁহার সহিত নদীয়া কৃষ্ণনগরের তৎকালীন

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। উঁহারাও অবসর মত অন্নদাবাবুর বাসায় মিলিত হইয়া মিডিয়ামের অনুষ্ঠান করিতেন। অন্নদাবাবুর পবিত্র আধারেই পরলোকগত আত্মার আবেশ হইত। একদিন ঐরূপ অবস্থায় তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এবার পূর্ব্ববঙ্গে জগদ্বন্ধু-রূপে গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হয়েছেন।"

ঐ কথায় উপস্থিত সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। কারণ তখন পর্য্যন্ত প্রভুর নাম উঁহাদের কর্ণ-গোচর হয় নাই। ইহার পর অনুসন্ধানের ফলে উঁহারা জানিতে পারিলেন, "ফরিদপুরে বালকজীবন জগদ্বন্ধু নামক একজন মহাপুরুষ আছেন। তাঁহার দেহশ্রী অতি অপূর্ব্ব। ক্ষণমাত্র দেখিলেই নয়ন জুড়াইয়া যায়। প্রায়ই তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করেন। বহু ব্যক্তির নিকট তিনি "প্রভু" বলিয়া পরিচিত। এই ঘটনার কিছুদিন পর আর একদিন মিডিয়ামের মুখে ব্যক্ত হইল "কলিকাতা হইতে যে ষ্টীমার নবদ্বীপে যায়, সেই ষ্টীমারের মধ্যে কাল তোমরা সেই জগদ্বন্ধুকে দেখ্‌তে পাবে। তাঁর মত রূপ লাবণ্যযুক্ত পুরুষ ঐ ষ্টীমারের মধ্যে আর একটিও থাক্‌বে না। তিনিই বর্ত্তমান সময়ে জীব উদ্ধারের জন্য একাধারে সর্ব্বশক্তি ল'য়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

মিডিয়ামের নির্দ্দেশ অনুসারে পরদিন যথাসময়ে অন্নদা-বাবু, শিশিরবাবু, মহেন্দ্রবাবু প্রমুখ অনেকে সোৎসুক চিত্তে

নির্দ্দিষ্ট ষ্টীমারে উঠিয়া প্রভুর দর্শন পান এবং তাঁহার নিরূপম রূপ লাবণ্য ও আকার ইঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়া যান। প্রভু তখন ফাষ্ট ক্লাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া চানা ভাজা ভোজন করিতেছিলেন। উক্ত ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া হাত পাতিলে তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতে ভুক্তাবশেষ চানা ভাজা দান করিলেন। উঁহারা পরমানন্দে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা পান। তিনি কিন্তু উঁহাদের প্রতি কোনরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন না, তবে অপরূপ হাবভাব দেখাইয়া সকলেরই প্রাণাকর্ষণ করিলেন।

ইহার পরদিনই শিশিরবাবু তাঁহাকে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ-বোধে অমৃতবাজার পত্রিকার স্তম্ভে এইরূপ লিখিলেন, "এবার রক্ত মাংসের শরীরে ভগবান এসেছেন, আমরা তাকে দেখাব।" প্রভু নবদ্বীপ হইতে ঐ কথা শ্রবণমাত্র যে স্থানে ছিলেন, তথা হইতে উঠিয়া দ্রুতবেগে স্থানান্তরে যাইতে লাগিলেন। জনৈক ভক্ত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওরে, শিশির ও ভারতীকে নিষেধ করে দিস্—তারা যেন এই ভাবে লোকের কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ না করে। একেই তো লোকে আমাকে 'দেখা দাও' 'দেখা দাও' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলে, তাতে যদি ওরাও আবার ঐরূপ করে, তবে আমি যে কোঠায় থাকি, সেখানকার ইট ক'খানা পর্য্যন্ত খসিয়ে ফেল্‌বে। তাদের বলিস্, বাতির আলোকে কখনও

সূর্য্যকে দেখ্‌তে হয় না। সূর্য্য স্বপ্রকাশ, সে যখন প্রকাশ পায়, জগতের সকলেই তাঁকে দেখ্‌তে পারে।”

ওদিকে অন্নদাবাবু, শিশিববাবু প্রভৃতি ষ্টীমারের সেই ক্ষণিক দর্শনে পরিতৃপ্ত না হইয়া কয়েকদিন পরে নবদ্বীপে পুনবায় প্রভুব দর্শনেব জন্য ছুটিয়া যান এবং ব্যতিব্যস্তভাবে নবদ্বীপের নানাস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কিন্তু প্রভু তৎপূর্ব্বেই নবদ্বীপ হইতে পাবনা গমন করিয়াছিলেন, কাজেই আর দর্শন পাইলেন না।

ইহার পর আর একদিন উক্ত মিডিয়াম কলিকাতার একটি গলিব নাম করিয়া বলিলেন, “ওখানে একজন গেরুয়াভূষিত জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে দেখ্‌তে পাবি। তাকে গিয়ে এখনই আমার কাছে নিয়ে আয়।” ঐ কথায় সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইযা জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিলেন। সত্যই সেখানে মিডিয়ামের বর্ণনা অনুরূপ একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাকে যথাযথ জানান হইলে, তিনি যন্ত্রচালিতবৎ মিডিয়ামের কাছে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, “তোকে এখনই জটাজুট মুণ্ডন কর্‌তে হবে এবং গেরুয়া ছেড়ে বৈষ্ণবোচিত বেশভূষা ধারণ কর্‌তে হবে। তোব অনেক কাজ। আমেরিকায় যেয়ে তোকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কর্‌ত হবে।”

প্রেমানন্দ ভাবতীব কথা

এই সন্ন্যাসীব নাম প্রেমানন্দ ভাবতী। প্রথম জীবনে ইনি মুন্সীগঞ্জেব একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। নাম ছিল

সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী। ইঁহার খুল্লতাত মাননীয় অনুকূলচন্দ্র মুখার্জ্জী কলিকাতা হাইকোর্টের ~~সর্ব্বপ্রথম~~ বাঙ্গালী জজ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ওকালতী অবস্থাতেই বারদীর ব্রহ্মচারীর ও বুড়োশিব হারাণ খ্যাপার কৃপার পরশ পান। অতঃপর তীব্র বৈরাগ্যভরে সংসার ত্যাগ করিয়া বারদীর ব্রহ্মচারীর অন্যতম প্রধান শিষ্য কাশীবাসী ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট যান। তিনিই তাঁহাকে সন্ন্যাস দান করেন। তৎপর হইতেই তিনি প্রেমানন্দ ভারতী নামে পরিচিত।

ভারতী মহারাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মিডিয়ামের আদেশ পালন করিলেন এবং কলিকাতার ভিতরেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শনেরও প্রবল বাসনা হইল। "প্রভুর স্বরূপ ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি" এই বিষয়ে তাঁহার মনে নানা আন্দোলন হইতে লাগিল। অতঃপর প্রভুর নিকট একখানি পত্রযোগে মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিম্নে ভারতী মহারাজের লিখিত পত্রখানি উদ্ধৃত হইল।

(পত্র)

কানাইয়া সে ত তুই রে,
কেন বঞ্চিত কাঁহে মুই রে ?
গোলোক অবতার,
সেবক মুই ছার,
কেন আলিঙ্গিতে চাই রে ?

দেখা নাই কথা নাই,
কোন তো সম্পর্ক নাই,
তবু ভাবি আমি বড় তুই ছোট ভাই রে ?
কোন কি জনমে মোর,
বড় ভাই ছিনু তোর,
স্নেহে হৃদে প্রেমসিন্ধু উথলে কি তাই রে ?
কোন্ পাপে বল্ তবে,
জনমিনু পুনঃ ভবে,
হেন পাপাচারী হয়ে কাতরে সুধাই রে ?
বল্ বল্ প্রাণ কানাই রে ?
প্রাণে তো জেনেছি তুই প্রাণ কানাই রে ;
ব্রজের সে কালাচাঁদ,
নদীয়ার গোরাচাঁদ,
সংশয় তো নাই ইথে সংশয় তো নাই রে !
ছিনু আমি তোর সাথে,
সংশয় নাহিক তাতে,
তোর প্রিয় কোন্ রূপে স্মরণ তো নাই রে !
হয়ে [illegible] অধিকারী,
এবে কেন পাপাচারী,
কেন হনু, বল্ বাপু, ভাবিয়া না পাই রে !
আর নাহি সরে কথা,
আর নাহি সহে ব্যথা,
পতিতে উদ্ধার কর্, তোরই দোহাই রে !
বুকে আয় প্রাণ কানাই রে !!

ভারতী মহারাজের এই পত্রখানি সখ্যরসে পরিপূর্ণ। প্রভু তাঁহাকে সুবলবটু বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া দর্শনের জন্য কাকুতি জানাইতে থাকিলেন কিন্তু প্রভু তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন দিলেন না। তবে অন্তরাল হইতে তাঁহার সহিত এমন মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন, যাহা শুনিয়া তাঁহার প্রাণমন গলিয়া গেল। কয়েক বৎসর পর প্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থে আমেরিকা প্রেরণ করিলেন। ভারতের মহাসম্মানীয় অতিথিরূপে তিনি ঐদেশবাসীর দ্বারা গৃহীত হন এবং দশবৎসরাধিক কাল যাবৎ নিউইয়র্ক, কালিফর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। ওদেশের ধর্ম্মপ্রাণ বহু নরনারীকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণ" নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়া উহার বহুল প্রচার করেন। তদ্দ্বারা আমেরিকাতে "শ্রীকৃষ্ণ হোম্" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে কতিপয় সাহেব-মেম সহ তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। উহাদের তিনি প্রভুর অপরূপরূপলাবণ্য ও মধুর লীলাকথা শুনাইয়া দর্শনের জন্য তৃষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রভু কিন্তু ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই গোয়ালচামটে কুটীরাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই উহাদের দর্শনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। ভারতী মহারাজ উক্ত আগত সেবক সেবিকাদের গৌরীদাসী, হরিমতী, হরিদাসী, লীলাময়ী, শ্যামদাস প্রভৃতি নামাকরণ করিয়াছিলেন।

বরাহনগরের পাটবাড়ীতে বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট কর্ত্তৃক যে অভিনব গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বাবাভারতীর ফটো (সাহেব-মেম শিষ্য শিষ্যাগণ সহ গ্রুপে), আমেরিকা হইতে তাঁহার ভারতাগমনের পূর্ব্বে ও অন্যান্য সময়ে লিখিত বহুপত্র এবং তাঁহার ব্যবহৃত পাগ্‌ড়ি এবং আরও অনেক দ্রব্য সুরক্ষিত আছে।

প্রেমানন্দ ভারতীর প্রভুর নিকট লিখিত পত্রের কথা এবং তাঁহার আমেরিকা গমনের সংবাদ প্রচারিত হইবার পর সমগ্র ভারতের সাধক, সিদ্ধ ও মহাজন মহলে প্রভুর নামের অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ হইতে অনেক প্রথিতনামা রাজা, জমিদার, শিক্ষিত, সুধী, মহাপ্রাণ ব্যক্তি প্রভুব কৃপাকাঙ্খায় ব্রাহ্মণকান্দা ছুটিয়া আসিতে থাকেন।

রামদাস বাবাজীব কথা

এই ব্রাহ্মণকান্দায় রাধিকা গুপ্ত নামক একটি বালক প্রভুর অনুগ্রহভাজন হন। ইনিই পরবর্ত্তী জীবনে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি যখন ফরিদপুর বঙ্গ-বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র, তখনই প্রথম প্রভুর দর্শন পান। একদিন তিনি স্কুল বসিবার পূর্ব্বে বালকের দলকে জিলা স্কুলের পশ্চাতে মাঠের দিকে ছুটিতে দেখিয়া কৌতূহলপরবশ ঐ স্থানে গেলেন এবং প্রভুর ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। ইহার পর কখনও বা পথে-ঘাটে, কখনও বা মেলার মাঠে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত;

দেখামাত্রই একটুখানি হাসির ঝলকে প্রভু তাঁহার মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন, কোন কথা বলিতেন না।

প্রথম দর্শনের কয়েক বৎসর পর ১৩০০ সালের মাঘ মাসে তিনি একদিন ব্রাহ্মণকান্দা প্রভুর নিকট যান। ঐ দিনই প্রভুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম বাক্যালাপ হইল। প্রভু তাঁহাকে সঙ্গে কবিয়া যশোহর রোডেব উপরস্থ একটী দেবদারু বৃক্ষমূলে আসিয়া বসেন এবং তাঁহাকে ধ্রুব-প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনাইতে থাকেন। প্রভুর মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হইলেও ঐ সব ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিল না। "এঁ'র কাছে আব আস্‌বো না" এইরূপ সঙ্কল্প কবিয়াই তিনি গৃহে ফিবিলেন। কিন্তু দুই দিন পবেই আবার ঐ মুখখানি মনে পড়িয়া গেল এবং অবিলম্বে তিনি ব্রাহ্মণকান্দা ছুটিয়া আসিলেন।

ঐ বৎসর তিনি ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অধিকাংশ সময় প্রভুর কাছেই অবস্থান করিতে থাকেন। ব্যবহারিক পড়াশুনা আর তাঁহাব ভাল লাগিল না। ঐ সময় হইতেই তিনি প্রভুর নির্দ্দেশমত হবিনাম জপকীর্ত্তন ও ভক্তিশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পরবৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে প্রভু তাঁহাকে নবদ্বীপ হরিসভায় গিয়া থাকিবার আদেশ দিয়া পাবনা চলিয়া গেলেন। তিনিও বন্ধুভক্ত দুঃখীরাম ঘোষের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া নবদ্বীপ উপস্থিত হইলেন।

নবদ্বীপে তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রেমানন্দ ভারতী, জয়নিতাই, চম্পটীঠাকুর, ব্রজবালা বা বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ

প্রভৃতি অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের সকলের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। কয়েকদিন পর প্রভু পাবনা হইতে নবদ্বীপে আসিলেন এবং হরিসভাতেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রভুর আগমনে নবদ্বীপধাম তুমুল কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসবও পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইল। অতঃপর বিজয়কৃষ্ণ, ব্রজবালা, প্রেমানন্দ প্রভৃতি নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন এবং প্রভু উক্ত ভক্তবালককে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণকান্দা ফিরিয়া আসিলেন। এইবার নবদ্বীপেই প্রভু তাঁহাকে ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট "রামদাস" নামে পরিচয় করাইয়া দেন।

রামদাসজী কয়েকদিন ব্রাহ্মণকান্দা থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যান। ঐ সময় তাঁহার পিতা তাঁহার কুষ্ঠীখানা দেখান। উহাতে "দারিদ্র্য, বন্ধুসহায়" এই বাক্যটির উল্লেখ ছিল। উহা দেখিয়া প্রভুবন্ধুকেই তিনি জীবনের পরম সহায়সম্পদ বলিয়া ধারণা করিলেন। তাঁহার মনের বৈরাগ্যভাবও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়া সদা প্রভুর সঙ্গে থাকিবেন এবং তাঁহার আদেশমত চলিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি মনে মনে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া ১৩০১ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনিও তাঁহাকে বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ জানাইলেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর। ক্ষণমাত্রও প্রভুর অদর্শন তাঁহার নিকট অসহনীয়। তথাপি আজ্ঞাপালনের ভাব মনের

মধ্যে প্রবল হইয়া পড়ায় তিনি কাঙ্গালবেশে ব্রজের পথে ছুটিলেন। প্রভুব নির্দ্দেশমত হাত্‌রাস জংসনে গিয়া অটল নন্দীর বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই তিনি প্রভুর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিতেন। এক দিকে তিনি তখন প্রাণপ্রিয়তম গুরুবন্ধুর সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, অন্য দিকে এত কাছে আসিয়াও ধামে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধিকাংশসময় নির্জ্জনে "হা বন্ধু" "হা বন্ধু" বলিয়া কাঁদিতেন। কয়েকদিন এইরূপ হা-হুতাশ কবিবার পর প্রভুর নিকট প্রাণেব ভাব ব্যক্ত করিয়া একখানি পত্র দিলেন। উহার কিয়দংশ এইরূপ ছিল ঃ—

"আমাব দুঃখ হবে, তুমি সুখে রবে,
সুখে থাক তুমি সুখময়।
ফেলে একা মোরে, বন্ধুহীন দেশে,
প্রাণ জগদ্বন্ধু কোথা র'লে বসে ;
আমি তোমার উদ্দেশে, যাব কোন্ দেশে,
কে দেবে পথের পরিচয় ॥'

প্রভু ঐ পত্রের উত্তরে লিখিলেন, "তুমি বাবুদের নিকট হ'তে গাড়ীভাড়া চেয়ে নিয়ে বৃন্দাবনে যাবে। গোবিন্দের পুরান মন্দিরে থাক্‌বে। মাধুকরী কর্‌বে। তারপর ফিরে আবার হাত্‌বাসে আস্‌বে। আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।" এই পত্রেই সর্ব্বপ্রথম তিনি তাঁহাকে "রামদাস" বলিয়া লিখিত ভাবে সম্বোধন করিলেন। রামদাসজী প্রভুর আদেশ পাইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং অন্ধকার রাত্রে একাকী কি

করিয়া পথ চিনিয়া যাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটী বর্ষীয়সী রমণী নিকটে আসিয়া তিনি কোথায় যাইবেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। তিনি গন্তব্য স্থানের নাম করিলে সেই বৃদ্ধা, "তার জন্যে কি বাবা, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব" এইরূপ বলিলেন এবং ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দের মন্দিরদরজায় গিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রামদাসজীর উঁহাকে সাক্ষাৎ যোগমায়া বলিয়া ধারণা হইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি উক্ত মন্দিরের প্রধান ফৌজদার চৈতন্যদাসজীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন এবং তিন দিন ওখানে থাকিবার পর রাধাকুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহার পর কয়েকদিন তিনি প্রভুর আদেশমত মাধুকরী করিয়া বনে বনে ঘুরিলেন এবং পুনরায় হাত্‌রাসে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ দিনই বৃন্দাবন দাসজী ফরিদপুর হইতে হাত্‌রাসে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং "প্রভু আসিতেছেন" এই সংবাদ দিলেন। "প্রভু আসিবেন" শুনিয়া ভক্তমহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। হরিদাস গোস্বামী, উপেন্দ্র গোস্বামী, অটল নন্দী প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ তাঁহার জন্য একখানি গৃহ গোবর জলাদি দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া রাখিলেন। তৎপরদিনই তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া প্রভু উক্ত ১৩০১ সালের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিন বৃন্দাবনে ছত্রিশগড় রাজার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবারে তিনি তিনমাসকাল বৃন্দাবনে ছিলেন। তন্মধ্যে একমাস কাল রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসগোস্বামীর

কুঞ্জে থাকিয়া নিয়মসেবা করেন। তিনি রাধাকুণ্ডের জলে স্নান করিতেন না। এমন কি, উহার বারি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না। একদিন তিনি রামদাসজীকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দ দর্শনে যাইবার সময় বলিলেন, "দেখিস্, কোন প্রকৃতি যেন আমাকে স্পর্শ না করে।" অতঃপর তিনি গোবিন্দের মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার সময় সহসা একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ছোঁয়াচ লাগিয়া গেল। অমনি প্রভু, "ওরে গেলাম্, জ্বলে গেলাম্। মর্লাম্!" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রামদাসজীর শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, এত যন্ত্রণা আমি জীবনে আর কখনও পাই নাই! তুই দূরে সরে যা। গেলাম্, মলাম্, জ্বলে গেল!" রামদাসজী দূরে গিয়া অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে প্রভু পুনঃ পুনঃ মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহাকে ডাকিলে তিনি ভয়ে ভয়ে রাস্তার অপর পাশ দিয়া চলিলেন। কাছে আসিতে সাহস হইল না। উহাতে প্রভু, "অত দূরে দূরে যাচ্ছিস্ কেন? কাছে আয়।" এইরূপ মধুর ভাষা প্রয়োগ করিলে তিনি নির্ভয় হইলেন। ক্রমশ প্রভু রাজর্ষি বনমালী রায়ের রাধা-বিনোদ কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী হইলে নামসংকীর্ত্তন গ্রন্থের একটী পদ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের সাম্নে দাঁড়িয়ে এই গান কর্বি। আমি কেশীঘাটে থাক্ব। গান শেষ হ'লে সেখানে যাবি।"

ভক্তবর আদেশ অনুযায়ী বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উক্ত গানটী গাহিলেন এবং নাম করিতে করিতেই প্রভুর নিকট ফিরিয়া চলিলেন। এদিকে রাজর্ষি-গৃহিনী ঝি-এর দ্বারা একটা ভাঁড়ে করিয়া প্রভুর জন্য গোবিন্দের প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। ঝি রামদাসজীর নিকটে আসিয়া রাণীমা, "প্রভুর জন্য প্রসাদ দিয়াছেন" বলিয়াই পাত্রটি তাঁহার হাতে দিল। তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতেই উহা বগলচাপা করিয়া লইলেন। প্রভুর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বগলে কি জানিতে চাহিলেন। রামদাসজী উত্তর দিলেন, "প্রসাদ।" পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কোথায় পেলি?" তিনি তখন প্রসাদ গ্রহণের ব্যাপার জানাইবামাত্র প্রভু প্রকৃতি সংশ্রব হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,"কি রে? প্রকৃতি স্পর্শ করলি! আমার শপথ, ঐরূপ কার্য্য আর কখনো করিস্ না।" প্রভুর এই আদেশই রামদাসজীকে ভবিষ্যৎ জীবনে কুভাবে কোন স্ত্রী শরীরের স্পর্শদোষাদি হইতে রক্ষার কারণ হইয়াছিল। ঐদিন প্রভু সে প্রসাদ আর গ্রহণ করিলেন না। দণ্ডবৎ করিয়া যমুনার জলে দিয়া দিলেন।

এইবার বৃন্দাবনেই প্রভু রামদাসজীকে আদর্শ নিয়ম নিষ্ঠার নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া দেন। একদিন প্রভুর সঙ্গে তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া তীরে উঠিলে প্রভু তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কালোফিতে পাঁড়টি ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলিলেন। ঐ কাপড় খানার দ্বারাই ডোর কৌপিন ও বহির্ব্বাস তৈয়ারী হইল। অতঃ-পর আদেশ করিলেন, "এই বহির্ব্বাস কৌপিন পর্। বৃন্দাবনে

থাক্‌বি। ভক্ত বৈষ্ণবের বেশ না থাক্‌লে মানায় না।" এই-রূপেই তিনি রামদাসজীকে ত্যাগধর্ম্মে জয়যুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর প্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "তুই বৃন্দাবনে থেকেই ভজন কর্।" তিনি কিন্তু প্রভুর সঙ্গছাড়া হইতে চাহিলেন না। উহাতে পুনঃ পুনঃ প্রভু বলিতে লাগিলেন, "থাক্, মঙ্গল হবে।" তিনি যখন দেখিলেন, প্রভু কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন না, তখন বলিলেন, "তবে থাকি।" ঐ কথায় প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ছি! চাদে কলঙ্ক হল।" অর্থাৎ অবিচারে আদেশ পালনের যে ইহা রীতি নহে, ইহাই প্রভু ঐ বাক্যে প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর রামদাসজী বৃন্দাবনে প্রভুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভজন করিতে থাকেন। প্রভু তাঁহাকে একখানি খাতায় ভজন সম্বন্ধীয় নানা নিগূঢ় কথা ও মন্ত্রাদি লিখিয়া দিয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল পর ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে থাকিবার সময় পত্রযোগে তাঁহাকে চলিয়া আসিতে লেখেন এবং ভাড়ার টাকাও পাঠাইয়া দেন। তিনিও উক্ত স্থানে আসিয়া প্রভুর সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। কিছুদিন এখানে প্রভুর সেবকরূপে থাকিবার পর তাঁহার সঙ্গে তিনি কলিকাতা চাষাধোপাপাড়ায় আসেন। প্রত্যহ তিনি প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া আনন্দ দিতেন। প্রভুর নির্দ্দেশমত সেবার কার্য্যাদিতেও লিপ্ত থাকিতেন। এই সময় হইতে তিনি একাদিক্রমে চার-পাঁচ বৎসর কাল বাকচর, ব্রাহ্মণকান্দা ও কলিকাতা রামবাগানে প্রভুর

সেবকরূপে অবস্থান করিয়াছেন। সে সমস্ত কথা শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইবে। কলিকাতায় আসিয়া তিনি পুনরায় বৃন্দাবন গিয়া ভজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমুখে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কি বৃন্দাবন বৃন্দাবন করিস্? কোন জিনিষ নিজে নিজে খেলে তাকে স্বার্থপর বলে। পাঁচজনকে খাইয়ে যে খায়, সে-ই প্রকৃত মানুষ। বর্ত্তমান যুগে হরিনামের দ্বারাই জগতের উপকার করা দরকার। জীবের দ্বারে দ্বারে নিতাই গৌরাঙ্গের নাম প্রচার করবি—এই তোর কাজ।" এইরূপেই প্রভু তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেন। জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধুর প্রাণমন্ত্র শিষ্য রামদাস বাবাজীকে তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদই দিন দিন ভক্তবৈষ্ণবসমাজে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়ারূপে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও পরবর্ত্তীকালে প্রভুর আদেশমত তিনি নবদ্বীপের বড় বাবাজী শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ-দাস বাবাজীর নিকট গিয়াছিলেন, তথাপি প্রভু জগদ্বন্ধুই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের পাবন মধুর লীলার লুপ্তপ্রায় বহু স্মৃতিকে পুনঃ সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া তিনি প্রেমাবতার প্রভুরই অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিতেছেন।

পাবনায় প্রভু

(ভক্তগণসঙ্গে)

ব্রাহ্মণকান্দা হইতে ১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে ভক্তসেবক গোকুলানন্দের সঙ্গে প্রভু পাবনায় যান। কয়েকদিন পরে ভুবনমোহন ঘোষ নামক একটি বালক তাঁহার সহিত গিয়া মিলিত হন। ব্রাহ্মণকান্দাতেই তিনি প্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। পাবনায় অবস্থান কালে প্রায় প্রত্যহ প্রভু বুড়োশিবের নিকট যাইতেন। ইনি মহাউদ্ধারণের অগ্রদূত-স্বরূপ ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য তিনি মহা-প্রভুর পুনরাবির্ভাবের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। ইঁহার নিকট হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদ ছিল না। হিন্দুগণ ইঁহাকে বুড়োশিব এবং মুসলমানগণ হারাণ ফকির বলিয়া ডাকিতেন। ইনি অবধূত স্বভাবে থাকিতেন। চিরস্বতন্ত্রতা-প্রিয় প্রভু ইঁহার সহিত গলাগলিভাবে শয়ন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। শিব প্রভুকে দেখামাত্র, "জগা এসেছিস্? আয় আয়!" বলিয়া পরমাদরে বরণ করিয়া লইতেন। দিগম্বরী দেবী একবার পাবনায় আসিয়া ইঁহাকে দর্শন করিতে গেলে ইনি বলিয়াছিলেন, "শোন্ দিদি, শোন্, তোদের জগা মানুষ নয়। জগাকে তোরা যত্ন করিস্। আর আমিও মানুষ

নই।" ইঁহার শরীরের কেহ ছায়া দেখিতে পায় নাই। কোন সময় রাজবাড়ীর জমিদার রামগোবিন্দবাবু ক্ষ্যাপার কাছে আসিলে তিনি তাঁহাকে একটি গুহার মধ্যে লইয়া যান। ঐ স্থানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রভুর মুখে বুড়োশিবের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা প্রকাশ পাইত।

পাবনাতেই জয়নিতাই ওরফে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রথম প্রভুর দর্শন পান। তিনি শিলং জিলা স্কুলের হেডমাষ্টারী ত্যাগ করিয়া অভিনব বৈরাগ্যভূষায় ভূষিত হন এবং 'জয় নিতাই' 'জয় নিতাই' বলিয়া নবদ্বীপের পথের

জয়নিতাই এর কথা

ধূলায় গড়াইতে থাকেন। হুগলীর মিডিয়ামের মুখ নির্গত প্রভুর পরিচয় শ্রবণ করিয়াই তিনি তাঁহার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পরে চম্পটী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দায় দর্শনের জন্য যান কিন্তু প্রভু পাবনা গিয়াছেন শুনিয়া সেখানেই ছুটিয়া আসেন। প্রভু তখন বৈদ্যনাথ চাকীর বাসায় ছিলেন। জয়নিতাই দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে প্রভু তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব। আমাকে দেখে কি হবে!" এই বলিয়াই তিনি নয়নের অন্তরাল হইলেন। জয়-নিতাইএর প্রাণ ঐ ক্ষণিক দর্শনে তৃপ্ত হইল না। প্রভুর বিশেষ কৃপা-প্রাপ্তির আশায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি গৃহমধ্য হইতে সঙ্কেতে তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। ভক্তবর উৎফুল্ল প্রাণে গৃহে প্রবেশ করিলে স্বহস্তে প্রভু দরজা বন্ধ করিয়া

দিয়া বলিলেন, "আমাকে সামান্য যোগী বা ব্রহ্মচারী মনে করিবেন না।" জয়নিতাই উত্তর দিলেন, "সামান্য যোগী বা ব্রহ্মচারী মনে কর্‌লে আপনাকে দর্শন কর্‌তে আস্‌তুম্ না।" এই বলিয়া তিনি প্রভুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ঐ রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মনে প্রবল অনুতাপ জন্মিল। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া কেন মুখের দিকে চাহিলেন. এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার মনোগতভাব বুঝিয়া বলিলেন, "যখন কোন ব্যক্তিকে দেখ্‌বেন, তখন তাঁহার পা দেখ্‌বেন; মুখ দেখ্‌বেন না। কারণ, মুখে মায়া আছে।" এই কথায় জয়নিতাই অন্যায় করিয়াছেন ভাবিয়া অধিকতর বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। উহা লক্ষ্য করিয়া প্রভু পুনরায় বলিলেন, "তাই ব'লে শচীনন্দনের মুখ দেখ্‌বেন না, এমন কথা বল্‌ছি না। ও মুখে মায়ার গন্ধ নাই।"

নিতাইনিষ্ঠ জয়নিতাই প্রভুর কথা শুনিয়া কিছু ব্যস্ততার সহিত প্রশ্ন করিলেন, "আর পদ্মাবতীনন্দন?' তদুত্তরে তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ঐ দুই মুখ অভিন্ন, ভেদ কোথায়?" এইরূপে প্রভুর সহিত জয়নিতাইএর প্রথম পরিচয় হইল এবং ক্রমশ তিনি তাঁহার একান্ত ভক্তরূপে পরিণত হইলেন।

পাবনা আসিয়া প্রভু প্রধানত বৈদ্যনাথ চাকী, দীনবন্ধু বাবাজী, জগৎ ভাদুড়ী ও রাজর্ষি বনমালী রায়ের ভবনে থাকিতেন। এখানেও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারী তাঁহার দর্শনের আশায় ছুটিয়া

পাবনায় অবস্থান চাতুরী

আসিত। এখানেই তাঁহাব প্রেমকমণ স্বভাবেব প্রথম প্রকাশ ঘটে। হাবান ক্ষ্যাপাব সহিত তাঁহাব ব্যবহাবও বহস্যপূর্ণ। পাবনায় তিনি যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানেই তাঁহার নিকট নানাপ্রকাব সেবাব দ্রব্য আসিত। প্রভুব অবস্থানকালে পাবনা সহব তখন আনন্দকলবোলে মুখবিত থাকিত। অনেকে তাঁহাব নিকট দীক্ষা গ্রহণেব জন্য প্রার্থনা জানাইত। তিনি যদি লৌকিক দীক্ষাদি দিতেন, তবে উক্ত সহবেব অধিকাংশ নবনাবী তাঁহাব দলভুক্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতা কখনও তিনি ত্যাগ কবেন নাই।

রাজর্ষি-ভবনে গমন

উপবোক্ত আষাঢ় মাসে প্রভু দীনবন্ধু বাবাজীর গৃহ হইতে নৌকাযোগে ভক্তবৃন্দেব সহিত বানোয়াবীনগব রাজর্ষি-ভবনে যান। তাঁহাকে দেখিলেই বাজবাড়ীর বালকবৃদ্ধ সকলে "জয় বাধে" "জয় রাধে" বলিয়া প্রণাম করিত। এখানে শ্রীশ্রীবাধাবিনোদেব সেবার অপূর্ব্ব পাবিপাট্য ছিল। তিনি ভক্তদেব বলিতেন, "ওরে বনমালীব বাধাবিনোদ জাগ্রত।" এখানে তিনি বাজপ্রাসাদেব একটী স্বতন্ত্র কক্ষে থাকিতেন। সেই স্থানেই বাজর্ষিব সঙ্গে তাঁহাব কথাবার্ত্তা হইত। দেবকীনন্দন প্রেসের কার্য্যপ্রণালী ও বৈষ্ণবগ্রন্থাদিব মুদ্রণবিষযে রাজর্ষি প্রভুব নির্দ্দেশ লইতেন। প্রভু এখানে থাকিতেই নবদ্বীপ হবিসভাব শিতিকণ্ঠ মহোদয় তাঁহাব দর্শনলালসায পাবনা গিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাব আগ্রহাতিশয্যে ভুবনকে সঙ্গে কবিয়া নবদ্বীপ

যাত্রা করিলেন। তখন কৃষ্ণনগর রেলপথ না হওয়ায় কুষ্টিয়ার ভিতর দিয়া নবদ্বীপে যাইতে হইত। প্রভু স্বরূপগঞ্জে আসিয়া পথিপার্শ্বে শস্পাসনে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, চাঁদের আলো ম্লান করিয়া তাঁহার অঙ্গজ্যোতি দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। পার্শ্ববর্ত্তী জনমণ্ডলী উহাতে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিল। চারিদিক হইতে "কে আপনি?" "কে আপনি?" পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রশ্ন হইতে লাগিল। প্রভুও স্মিতহাস্য সহকারে প্রতিবারই "সাধু রে সাধু" এই উত্তর দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ সকলকে দর্শন দিবার পর তিনি নৌকা পার হইয়া নবদ্বীপ পৌঁছিলেন এবং হরিসভাতে গিয়া উঠিলেন।

নবদ্বীপে প্রভু

শিতিকণ্ঠ মহাশয়ের পিতামহ ব্রজনাথ ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক নবদ্বীপেব হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপুত্র মথুরনাথ পদরত্ন পবম পণ্ডিত এবং ভাগবত কুলবত্ন ছিলেন। এখানে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর নৃত্যাবেশমূর্ত্তিব সেবার্চ্চনা হয়। প্রভু এখানে অনেকবাব আসিয়াছেন। এইবার আসিয়াই তিনি ভুবনকে "নবদ্বীপ দাস" নাম দেন এবং তিলক তুলসীমালা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে ভজনোন্মুখ কবিয়া তুলেন।

প্রভু কখনও ব্রাহ্মণকান্দা, বাকচর প্রভৃতি স্থান হইতে, কখনও পাবনা যাইবার পথে, কখনও পাবনা হইতে ফিরিবার পথে, কখনও বা কলিকাতা হইতে নবদ্বীপে আসিতেন। তিনি বিগ্রহমন্দিরে ভেটপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। হরিকথা, পদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তনগ্রন্থে নবদ্বীপ ধাম ও গৌরলীলা-মাধুর্য্য বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার তিনি লোক গণনাব সময় এখানকার একটি ব্রাহ্মণ-ভক্তের বাড়ী আসিয়া বলেন, "আপনারা আমাকে একটু স্থান দেন। দেখ্‌বেন, আমাকে যেন ওরা মানুষগণনার মধ্যে না ফেলে।"

পূর্ব্বোক্ত বৎসর আশ্বিন মাসে প্রভু নবদ্বীপ হইতে বাক্‌চর ফিরিবার পথে কৃষ্ণনগর আসেন। সেখানে সর্ব্বসুখ সান্যাল

নামক এক ব্যক্তি প্রভুর কৃপাভাজন হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন। সর্ব্বদা রাজসিকভাবে থাকিতেন। সাধারণত হরিনামনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের একটা উপেক্ষার ভাব থাকে, বিশেষত জগতের কিছুই তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। সর্ব্বস্থখও ঠিক সেই প্রকৃতির ছিলেন। প্রভু একদিন একজন ভক্তসঙ্গে রাস্তা দিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে দেখিতে পান। ইনি তখন একটি দোকানে বসিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওর একটা কঠিন ব্যাধির লক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি।" সর্ব্বস্থখের কর্ণে ঐ কথা প্রবেশ করিল। প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মোহিত হইলেন বটে কিন্তু পূর্ব্ব স্বভাববশত ঐ কথা গ্রাহ্য করিলেন না।

সর্ব্বস্থখ সান্যালের কথা

অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইল বীর সান্যাল মহোদয় কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রাস্তায় দৃষ্ট সেই অপূর্ব্ব পুরুষের কথা তাঁহার মনে উদিত হইল এবং ঐ অজানা দেবতার কৃপাকাঙ্খায় তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে প্রভুও কোথা হইতে যেন চকিতের মত আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। প্রভুর কৃপায় সর্ব্বস্থখ নিরাময় হইলেন। তাঁহার মনপ্রাণও ঐ চরণে সমর্পিত হইল। তাঁহাকে প্রভু মধ্যে মধ্যে পত্রযোগে উপদেশ দিতেন। কোনসময় তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রেষ্ঠাচার লিপিকা

ভাই বন্ধু প্রতিবেশী কুটুম্ব স্বজনে,
সত্য স্নেহ সদাচারে তুষিও সতত।
বিরোধ বিদ্বেষ ভাব রাখিও না মনে,
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে খাদ্য দিও সাধ্যমত।
ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখি কর্ম্ম করিও পালন,
যাইও সে স্থানে যথা সাধু আগমন॥
সাধুর চরণে পড়ি, সুখে দিও গড়াগড়ি,
বসিও অদূরে রহে ইতর যেমন,
চঞ্চলতা ব্যাকুলতা করিও বর্জ্জন।
কুস্থানে গমন আর কুদৃশ্য দর্শন,
কুস্পৃশ্য স্পর্শন কভু কুভক্ষ্য ভক্ষন,
কুসঙ্গ, কুরুচি ক্রোধ, কুজনের অনুরোধ,
কুদান গ্রহণ, কভু কুগ্রন্থ পঠন—
এ সকল কায়মনে করিও বর্জ্জন।
সমগ্রীব হয়ে বসি স্বস্তিক আসনে,
নাসাগ্রেতে দৃষ্টি সদা রাখিও যতনে,
ব্রজ, সৃষ্টি, রূপ, লীলা, যৈছে হরি আচরিলা,
বিচারিও এ সকল আপনার মনে,
সমগ্রীব হয়ে বসি স্বস্তিক আসনে।
অবিবেকতা ও চৌর্য্য, হিংসা, মোহ, মায়া,

নিদ্রা, তন্দ্রা, লোভ, ক্ষোভ, আলস্য, অসত্য,
ত্যজিলে এসব তবে শুদ্ধ হয় কায়া,
নতুবা কি মনোপরে শোভে আধিপত্য ?
শাস্ত্রপাঠ, জীবে দয়া, সত্যের সেবন,
অল্পাহার, গম্ভীরতা, অভ্যাস করিবে।
বেদ বিধিমতে সব করিবে পালন,
সর্ব্বজন সহ মম আশীষ জানিবে।
গোবিন্দে অর্পিও সব ওহে মতিমান,
পার্থিব সুখেতে কভু তৃপ্তি নাহি হবে।
পুরাণ, বেদান্ত, বেদ, সাংখ্যের প্রমাণ
বিনা চিত্তবৃত্তি রোধে শান্তি কি সম্ভবে ?

কলিকাতায় প্রভু

প্রভু নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে ক্রমশ বাকচরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং কয়েক দিন পর বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি রাসপূর্ণিমার পূর্ব্বে ব্রজে গিয়া দুই-তিন মাস থাকিতেন। উক্ত ১৩০০ সালের মাঘমাসে বৃন্দাবন হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ফরিদপুরের বুনাজাতির ন্যায় রামবাগানের ডোমজাতির পরিবর্ত্তন তাঁহার পতিতোদ্ধারণ কার্য্যসমূহের অন্যতম। তাঁহার আগমনে রাম-বাগান সেদিন তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল। এইস্থানে তাঁহার কৃপাকাঙ্খায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার মুণীন্দ্র দেব বাহাদুর, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরীশঙ্কর দে, হর রায়, ফটিক মজুমদার প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী জমিদারগণ ও উচ্চশিক্ষিত সুধীবর্গ ধূলিধূসরিতভাবে অবস্থান করিতেন। শত শত সাধারণ নরনারীও তাঁহার দর্শনলালসায় প্রতিদিন ছুটিয়া আসিত।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সেদিন অস্পৃশ্যতারূপ ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু আসিয়া ধর্ম্মের এই গ্লানি দূর করিবার উপায় দেখাইতে ডোমজাতির সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে ঠাকুর অতুলকৃষ্ণ চম্পটী মহাশয়

প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ ইনি আড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারী ত্যাগ করিয়া প্রভুর অন্যতম সেবকরূপে পরিণত হইয়াছেন। নির্বিচারে প্রভুর আদেশ পালনই ইহার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। প্রভুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলায় অল্পদিনেব মধ্যেই ডোমগণ আদর্শ হিন্দুজাতীয়তায় উন্নীত হইয়া উঠিল। প্রভুকেই একমাত্র ইষ্টবোধে ঐ চরণে তাহারা সগোষ্ঠী আত্মসমর্পণ করিল।

প্রভু অনেক সময় বলিতেন, "এবার এই রামবাগান হইতে সমস্ত পৃথিবা উদ্ধার হইবে।" এইস্থানে তিনি যে আদর্শের বীজ বপন কবিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই নানাপ্রকাব জাতীয় জাগরণমূলক কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সমাজ-সংস্কাব, শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলনের ইহা আদ্যাপীঠ স্বরূপ। দীনবৎসল প্রভু রামবাগানেব ডোম বালকদের উদ্দেশ্যে বলিতেন, "ওদের সাক্ষাৎ ব্রজবালক ব'লে মনে কর্‌বি।" ডোমনাদের প্রভু বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে তুলনা কবিয়া বলিতেন, "ওদের ঘরে নিত্য মাধুকবী কর্‌বি।" যে সমস্ত ভক্তকে প্রভু নানাপ্রকার নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে রাখিতেন, যাহাদেব স্বপাক ভিন্ন অন্নগ্রহণ করা নিষেধ ছিল, তাঁহাদেরও মধ্যে মধ্যে রাম-বাগানের ডোমদের ঘরে মাধুকরী করিবার জন্য পাঠাইতেন। নিজেও তাহাদের দেওয়া সেবার দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিতেন। ফরিদপুরের বুনাদেব ন্যায় এই ডোমদেরও প্রভু 'মোহন্ত' উপাধি দান করেন। ডোমকুলপ্রধান হরিদাস, তিনকড়ি, পীতাম্বর প্রভৃতি উন্নতসত্তা বৈষ্ণব মহাজনরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

অহর্নিশি ইহারা ভাগবতধর্ম্ম আলোচনায় ও হরিনাম সংকীর্ত্তন-রসে নিমগ্ন থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে এই পল্লীতে সংকীর্ত্তন, মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত এবং তাহাতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতেন। ডোম ভক্তদের অনেকে কীর্ত্তনবিদ্যায় পারদর্শী ও মৃদঙ্গ বাদ্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হরিদাসকে প্রভু 'হিতহরি ডোম,' তিনকড়িকে 'দয়াল তিনকড়ি' ও পীতাম্বরকে 'তাত পীতাম্বর' আখ্যা দিয়াছিলেন।

*

শ্রীমান হরিদাস যখনই মৃদঙ্গ হস্তে হরিনাম কীর্ত্তনে অবতীর্ণ হইয়া বাদ্য আরম্ভ করিতেন, তখনই মনে হইত—সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল, অশান্তি সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুল নির্ম্মল আনন্দ এবং পরম শান্তির উদয় হইল। কোনসময় প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, "যে নাম সংকীর্ত্তনে হরিদাস উপস্থিত নাই, সেই নামসংকীর্ত্তন বৃথা; তাহা নামসংকীর্ত্তনই নয়।" প্রভুর এই ভক্ত মহিমাজ্ঞাপক বাক্যের দ্বারা হরিদাসকে তিনি কি জন্য হিত আখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য হয়। এই হরিদাস সময় সময় অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতেন। একদিন দেখিয়াছিলেন, "রামবাগানে জমি দখল সম্বন্ধে জমিদারে জমিদারে ভীষণ বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে জমি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বহু পুরাতন উত্তম ইষ্টক বাহির হইতে লাগিল। উহার প্রত্যেকখানি ইষ্টকের গাত্রে স্পষ্টাক্ষরে শ্রীশ্রীপ্রভুর নাম খোদিত ছিল। ইহা দেখিয়াই সকল বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার

করিলেন, রামবাগানের সমস্ত জায়গা জমি একমাত্র প্রভুরই, আর কাহারও নহে।

ইহার পর আর একদিন হরিদাস দিব্যভাবযোগে দেখিতে পাইলেন, 'শ্রীশ্রীপ্রভুই রামবাগানের একমাত্র স্বাধীন সম্রাট' (Sole Monarch or Emperor) এই কথাটি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইবার পর বীডন স্কোয়ারের নিকট হইতে প্রচণ্ড পরিমাণে কামানের গোলা রামবাগানের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাঁহারা গোলাগুলি বর্ষণ করিতেছিল, সে সমস্ত প্রচণ্ড বেগে তাহাদেরই উপরে পড়িতে লাগিল। উহাতে অনেকে নিহত হইল। যাহারা বাকী ছিল, তাহারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

হরিদাসের আর একদিনের স্বপ্ন এইরূপ ছিল। তিনি দেখিতেছেন, রামবাগানের মধ্যস্থলে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত এক বিরাট মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার অপ্রাকৃতভাবে সুসজ্জিত তোরণতলে চম্পটী ঠাকুর বসিয়া আছেন। তিনি যাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইতেছেন, সে-ই ভিতরে গিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিতেছে। আর চারিদিকে অতি বিশুদ্ধ পরম সুগন্ধময় গব্যঘৃত, সরিষার তৈল ও আরও নানা-প্রকার দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্তূপীকৃত রহিয়াছে এবং সকলেই ইচ্ছামত ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতেছে।

এই স্বপ্নগুলির মধ্যে রামবাগানের কোন অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আছে কি না, কে বলিতে পারে? তবে

ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রভুর মহাপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রামবাগানের অবস্থাও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে।

প্রভুর সাক্ষাৎভাবে রামবাগানে অবস্থানকালে কলিকাতায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদের অত্যধিক প্রভাব ছিল। তাঁহারা কখনও রাস্তার মোড়ে মোড়ে, কখনও বা গোলদীঘির পারে দাঁড়াইয়া হিন্দুধর্ম্ম তথা দেবদেবীর উপর অসঙ্গত আক্রমণমূলক বক্তৃতা দিতেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চম্পটী মহাশয় ঐ সমুদয় বক্তৃতা শ্রবণে নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। যে সমস্ত পাদ্রীসাহেব তখন ঐরূপ ধর্ম্ম বক্তৃতা করিতেন, তাঁহাদের অনেকের ব্যক্তিগত চরিত্র দোষদুষ্ট ছিল। চম্পটী মহাশয় তাহা বিশেষভাবে জানিতেন। তখন তিনি "A Key to the Missonary" নাম দিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। উহার একখণ্ড তিনি তৎকালীন পাদ্রীদের মুখপাত্রস্বরূপ শ্রীরামপুরের ম্যাক্-ডোনাণ্ড সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং একখানি পত্রের দ্বারা পাদ্রীগণ কিরূপে কলিকাতার হিন্দু নাগরিকদের প্রাণে ব্যথার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও জানান। অতঃপর প্রভুর নিকট আসিলে, তিনি মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে বলিতে লাগিলেন, "অতুল, ইংরেজকে কি চিঠি লিখে উত্তেজিত করতে আছে?" চম্পটী মহাশয় উত্তর দিলেন, "উনি তো পাদ্রী।" প্রভু ঐ কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পাদ্রী। ওরা কি তোদের মত দু-হাত দু-পাযাওলা মানুষ! অসুর। অসুরকে উত্তেজিত করলে সমস্ত পৃথিবী হলাহলে আচ্ছন্ন করে দেবে। কিন্তু

পাদ্রীসংবাদ ও প্রভুর বাণী

অসুরকে বশ ক'রে কাজ করিয়ে নেবার শক্তি তো কারো নাই। সে শক্তি আমার, কেন না, আমি ওদের weak points (উইক্ পয়েন্টস্) জানি।" কিছুক্ষণ থামিয়া প্রভু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "শিশির, সুরেন্দ্রের মত পাগ্‌লামি করিস্ নে। ওরে, ইংরেজ তোদের জগন্নাথ-পুরী যাবার রেলগাড়ী ক'রে দেছে, পাবনা, ফরিদপুরে আস্‌বার রেলগাড়ী ক'রে দেছে ; তাই তো তোরা এত সকালে আমার কাছে আস্‌তে পারিস্। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে থাক্‌তেন, তখন ন'দে শান্তিপুরের ভক্তেরা, তাঁকে যারা দর্শন কর্‌তে যেত, তারা কি আর ফিরে আস্‌বে বলে যেত! উইল ক'রে যেত! ইংরেজ ভক্তসেবা কর্‌ছে, সুতরাং মহাপ্রভুর কৃপা পাবার যোগ্য পাত্র। এই যে হরিনাম সংকীর্ত্তন যার জন্যে ঘর-বাড়ী ছেড়েছিস্, মাগ-ছেলে ছেড়েছিস্, চাক্‌রি-বাক্‌রি ছেড়েছিস্, এই হরিনাম সংকীর্ত্তনকে যদি আপনার কর্‌তে চাস্ ও প্রবল দেখ্‌তে চাস্, তা হ'লে ইংরেজের সহায়তার প্রয়োজন সুতরাং আজ থেকে ইংরেজকে সুহৃদ ব'লে জান্‌বি।"

১২৯৫ হইতে ১৩০৯—এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে প্রভু একাদিক্রমে ছয়মাসকালও কোনও স্থানে অবস্থান করেন নাই। অতি অভিনবভাবে সনাতন ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার মর্ম্মমাধুরী বিলাইতে কেবলই তিনি একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতেন। স্বকীয় প্রেমলাবণ্যময় মূর্ত্তিখানি দেখাইয়া তিনি অনেক সুকৃতিমানের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার

প্রভুর ধরণের ধারা

করিতেন এবং তাঁহাদিগকে দেশ ও জাতির কল্যাণব্রতে দীক্ষিত করিয়া তুলিতেন। যে কেহ স্বজাতীয়ভাবে একবার মাত্র দেখিলেই প্রাণপটে তাঁহাকে চিরঅঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। কাহাকেও বা দেখা না দিয়াই তিনি স্বঅভিপ্রেত কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান যুগোন্নতিমূলক অনেক কিছুরই তিনি মূল কারণ হইয়া রহিয়াছেন। যে সকল মনীষি মহাপ্রাণ ব্যক্তি বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বাহ্নে দেশপূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রভুর কৃপার পরশ পাইয়াছেন। ব্যবহারিকভাবে মন্ত্রাদি না দিলেও অনেক কিছুর তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাহাকেও মন্ত্রশিষ্য না করার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মানুষ গুরুমন্ত্র দেন কানে। জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।" বাস্তবিকই তিনি প্রাণ-মন্ত্রযোগে অনেকের ভিতর শক্তি সঞ্চার করিতেন। নিজে কোন সম্প্রদায়বিশেষ বা দলবিশেষের সৃষ্টি না করিয়া, উদার অসাম্প্রদায়িক বা সার্ব্বজনীনভাবে যেখানে ভক্তিভাবাপ্লুত নির্ম্মল প্রাণ, সেখানেই তিনি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে করুণার ছোঁয়া দিয়াছেন।

হরিনাম প্রচারের দ্বারা জনকল্যাণ সাধনই চম্পটী মহাশয়ের অন্যতম কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আজ কয়দিন যাবৎ তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতার ভাগ্যাকাশেও যেন প্রলয়ঝঞ্ঝাসঙ্কুল একখানি কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। চম্পটী মহাশয়ের প্রাণটিও

কলিকাতায় বিশেষ শক্তির প্রকাশ ও প্লেগ মহামারীর কথা

গভীর বিষাদে মলিন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সময় একদিন তিনি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কোথা হইতে যেন দ্রুত-বেগে বাগানে ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রভুর নিকট ঝলিটা ঝপাৎ করিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই ন্যাও তোমার ঝোলা।" অনন্তর হাতের করতাল জোড়া ঝুলির উপর রাখিয়া বলিলেন, "এই ন্যাও তোমার করতাল। আমার দ্বারা তোমার আর কিছু হবে না। আমি আর এত ছুটাছুটি করতে পারবো না। কি আশ্চর্য্য! যারা কথাটি পর্য্যন্ত বলতে সাহস করত না, তারা এখন গায়ে থুথু দিতে আসে। বন্ধুবান্ধবেরা পাগল ব'লে উপহাস করে! আমিও এই ক'দিন ধরে ভাবছি, 'সত্যি সত্যি জীবনে হ'ল কি? তুমিই বা করলে কি? শৃগাল, কুকুরের মত মানুষগুলি দিন-রাত কামিনীকাঞ্চনরূপ গলিত শব নিয়ে টানাটানি করছে। হরিনামে বিশ্বাস-ভক্তি তো কারো দেখতে পাই না। তুমি এত বড় প্রভু, কিন্তু তুমি করলে কি? কেউ তো তোমাকে চিনল না!"

প্রভু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চম্পটীর কথা শুনিলেন, তারপর স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "অতুল, সময়—সময়—সময়! দেখছিস্ নে, এমন যে দুর্দ্দমনীয় ইংরেজ, তারাও দিন দিন কেমন শীর্ণ বিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটি গাছ যখন বাড়ে, তখন কি তোরা বুঝতে পারিস্, কতটুকু ক'রে বাড়ছে। শেষে দশ দিন পরে দেখিস্, কত বড় হয়েছে। আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তোরা কতটুকু কি বুঝবি? অমন পাগলামি করতে

নেই। শান্তভাবে হরিনাম কর্‌তে থাক্। এটি প্রলয়কাল—কীর্ত্তন সত্য। এযুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেউ হরিনাম করুক্ না করুক্, তাতে তোর কিছু আসে যায় না। তুই অবিচারে যেখানে সেখানে হরিনাম ক'রে বেড়াবি। রাত্রিকাল পাপীতাপীর কলুষ শ্রাদ্ধের সময়। শেষরাত্রে যাতে সকলে হরিনাম শুনতে পায়, তা করবি। হরিনাম শুনলেই জীবের কল্যাণ হবে। সবাই হরিনামের ভিখারী সে'জে বসে আছে। দেখ্‌বি, শীঘ্রই স্থানবিশেষে একটি বিশেষ শক্তির প্রকাশ হবে।"

প্রভুর সুধামাখা কথাগুলি শুনিয়া চম্পটী মহাশয়ের বিষাদ মালিন্য দূর হইয়া গেল। তিনি উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় প্রভো? কোথায় বিশেষ শক্তির প্রকাশ হবে?" প্রভু উত্তর দিলেন, "তোদের এই কল্‌কাতায়।" অতঃপর তিনি শিশিরবাবুর নাম করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌বি, শিশিরের দ্বারা এবার হরিনাম প্রচারের অনেক সহায়তা হবে।" তিনি কলিকাতা কুমারটুলীর ফটিক মজুমদারের বাড়ীতে থাকিবার সময় শিশিরবাবু প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতেন। তিনি আড়াল হইতে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন, দেখা দিতেন না। প্রভুর কৃপাই তাঁহার জীবনে বিশেষভাবের পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল। ঐ কৃপার বলেই তিনি "অমিয়-নিমাই চরিত" প্রকাশ করেন। প্রভু তাঁহাকে 'প্রলয়কাল, নামের অভাব, হরিনাম কর, টহলই শেষ ধর্ম্ম" এইরূপ উপদেশ দিতেন। দেওঘরে থাকিবার সময় তাঁহার নিকট শ্রীহস্তে চিঠি-

পত্র লিখিতেন। প্রভুর আদেশ মত তিনি করতাল বাজাইয়া টহল দিতেন। সেদিন প্রভু রামবাগান হইতে চম্পটী মহাশয়কে ইহার নিকট পাঠাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে আর রামবাগানে দেখিতে পাইলেন না। তখন মন্দিরের মধ্যে তাঁহার পরিত্যক্ত কিছু আছে কিনা, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যে শুচিশুদ্ধ দরমার আসনে প্রভু বসিতেন, তাহার নীচে একখানি নোটবুক পাইলেন। উহা খুলিতেই প্রভুর হস্তাক্ষর দৃষ্ট হইল। উহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল :—**ভক্তের লিষ্ট। লর্ড কার্জ্জন। শিশির ঘোষ। দ্বারিকা মিত্র। যতীন ঠাকুর।**

চম্পটী ঠাকুর কি জন্য প্রভু ঐ নামগুলি লিখিলেন, বুঝিতে না পারিয়া শিশির বাবুর নিকট নোটবুকখানি লইয়া গেলেন। উভয়ে তখন আলোচনার দ্বারা স্থির করিলেন, প্রভুর সেই বিশেষ-শক্তি-প্রকাশিকা লীলার সঙ্গেই বোধহয় এই ব্যক্তি-গণের সম্বন্ধ আছে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর প্রকোপ দেখা দিল। প্রলয়ের ঐ কুটিল ভ্রূকুটিতে কলিকাতাবাসিগণের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। উক্ত মহামারীজনিত মৃত্যুর হার দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল। প্রাণের ভয়ে তখন দলে দলে নরনারী সহর ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। উহাতে তৎকালীন বাংলার গভর্ণর মহামান্য লর্ড কার্জ্জন সাহেব মফঃস্বলে ঐ রোগবিস্তৃতির আশঙ্কায় বিষম প্রমাদ গণিলেন এবং কোন ব্যক্তিরই

কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র গমন নিষেধ করিয়া দিলেন। সহরের চারিদিক পুলিস ঘেরাও করিয়া রাখা হইল।

অহো! অমন শোভন সুন্দর মহানগরী আজ শ্মশান হইতে চলিয়াছে। গভর্ণর বাহাদুর হইতে উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীসকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ করিয়া কত কি প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। অতঃপর মহাত্মা শিশির ঘোষ গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র ও জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহচর্য্যে বীডন স্কোয়ারে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ সভায় দশ সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিল। আমাদের চম্পটী ঠাকুর ঐ সভায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা যে কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ কমিয়া যায়, এই বিষয়ে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অতঃপব শিশিরবাবুর প্রস্তাবক্রমে কলিকাতাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গড়ের মাঠে বিরাটভাবে মহাসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা স্থির হইল। বাবু ভদ্দরেরা তখন কীর্ত্তনের ধার ধারেন না বরং উহাকে ছোটলোকের ধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করেন। কাজেই রামবাগানের ডোমসম্প্রদায়কে উক্ত মহাকীর্ত্তন উৎসবের অগ্রণী হইতে হইল। ক্রমে জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক প্রাণের দায়ে কীর্ত্তন-কর্ত্তব্যে ব্রতী হইয়া পড়িল। গলিতে গলিতে শত শত সংকীর্ত্তন বাহিনী এইরূপ ধ্বংস-বিষাদের মধ্যে হরিউল্লাসে মধুপ্লাবন বহাইয়া দিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান,

প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির গণ্ডী ধরাশায়ী হইল। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, উচ্চ, নীচ সকলে মিলিয়া মহামিলন উৎসবে মত্ত হইলেন। ধর্ম্মতলা মস্‌জিদের গোঁড়া মৌলভীগণ পর্য্যন্ত আর্ভিব সহিত হরিহুহুঙ্কার আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং লর্ড কার্জ্জন মহোদয় পর্য্যন্ত জুতা টুপী খুলিয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনের মর্য্যাদা দিলেন।

ক্রমে উক্ত কীর্ত্তনবাহিনীগুলি গড়ের মাঠ হইতে রামবাগান অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রভুও স্বীয় মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তনবিহ্বল সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তিনিও আপনাব অনিন্দ্যসুন্দর মোহন মূর্ত্তিখানি সকলের নয়নগোচর করিয়া তুলিলেন। তাঁহাকে দেখামাত্র সকলের সমবেত কণ্ঠের তুমুল হরিধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত হইল। চম্পটী ঠাকুর উক্ত সংকীর্ত্তন প্রসেসনের আন্তোপান্ত অপূর্ব্ব নৃত্য ও কীর্ত্তন কলরোলে লিপ্ত ছিলেন। কলিকাতায় বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখিয়া প্রভুর অপূর্ব্ব মহিমায় মনঃপ্রাণ তাঁহার পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

এই মহাসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠানের পর হইতে উক্ত প্লেগ মহামারীও আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। কীর্ত্তনের শক্তিই কলিকাতাব নাগরিকদেব প্রাণে শান্তি সান্ত্বনা ফিবাইয়া আনিল। কলিকাতার এই প্লেগ মহামারী বাংলা ১৩০৭ সালের ঘটনা। ঐ সংকীর্ত্তন প্রসেসনেব নানারূপ চিত্রপট গৃহীত হইয়াছিল। সহরের নানাস্থানে ঐগুলিব প্রতিমূর্ত্তি

কিছুকাল যাবত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রী হইত। কলিকাতার এই প্লেগ মহামারীর প্রতিকারেব উপায় অনুধাবনার দ্বারা বর্ত্তমানকালের ধ্বংসপ্রলয়ের হস্ত হইতে সৃষ্টিবক্ষার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে হয়, অচিরেই সমগ্র মানবজাতি প্রাণের দায়ে হরিনামধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া উঠিবে। প্রভুও ভবিষ্যৎবাণী করিয়া রাখিয়াছেন, "এখন আমি ঘরে ঘবে এত সেধে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কেউ হবিনাম কর্‌ল না। দেখ্‌বি, এমন একদিন আস্‌বে, যেদিন Bay of Bengal Man of warএ ছেয়ে যাবে। তখন কি ধনী, কি নির্ধন, কি রাজা, কি প্রজা, কি সাধু, কি অসাধু, সকলেই নাকের জলে, চোখের জলে এক হয়ে যাবে। তখন দায় ঠেকে সকলে হরিনাম করবে।"

সনাতন ধর্ম্ম ও প্রভুব লালা বৈচিত্র্য

প্রভু যখন প্রচ্ছন্নভাবে কলিকাতা অবস্থান করিতেছেন, দিকে দিকে তখন কত আন্দোলন আবম্ভ হইয়াছে। বাংলা ভারত ভরিয়া ভগবদ্‌উন্মুখী একটি ভাবেব হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। লোকচক্ষুব অন্তরালে প্রেমভক্তি-বাদেরই যেন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। সকলের চিত্তই তখন নূতন একটি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। নিরাকার ব্রহ্ম উপাসকগণও ভক্তিধর্ম্মের বিমল আদর্শে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। গোস্বামীপাদ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মাধর্ম্মের মধ্যে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বারাও সগৌরবে ভক্তিধর্ম্মধ্বজা উত্তোলিত হইয়াছে। তান্ত্রিক

শিক্ষাদীক্ষার বিশুদ্ধি প্রতিপাদনে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও তদবরপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মকে বিশ্ববিজয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। এদিকে সুপ্রচ্ছন্নভাবে রাজধানী-নগরী কলিকাতার বক্ষে অবস্থান করিয়া প্রেমময় প্রভু যে সমস্ত লীলাভিনয় করিতেছেন, তাহা শুধু বৈধী কোন ধর্ম্মাচরণ নয়, পরন্তু উহা তাঁহার স্বকীয় জগদুদ্ধারণ লীলারই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। যুগমানব উন্নয়নের সমুদয় ধারাকে স্বীয় করুণা-শক্তি সঞ্চারে তিনি এক অভিনবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছেন। অধ্যাত্মশক্তির আদি উৎসস্বরূপ তিনি তাঁহার সুমহতী ইচ্ছাই যেন ভিন্ন ভিন্ন আধার অবলম্বনে জীব-জগৎ কল্যাণে ব্রতী হইয়াছে। বস্তুতঃই তিনি কোন সম্প্রদায় গঠন করিতেছেন না বা নব্য কোন মতেরও প্রবর্ত্তক সাজিতেছেন না।

এই যে সেদিন নদীয়ার আকাশে গৌরচন্দ্র উদিত হইলেন—তিনি যে কি মধুর লীলা করিয়া গেলেন, কেহই তাহা বুঝিল না। অধিকন্তু সত্যিকার কল্যাণদায়িনী ঐ লীলাস্মৃতিগুলির উপর সহসা বিজাতীয়ভাবের আবরণ পড়িয়া গেল। প্রেমধর্ম্ম ভক্তিবাদে নিষ্ঠাহারা হইয়া আমরা পাশ্চাত্যের উৎকট কর্ম্মবাদ ও ভোগবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হিন্দুধর্ম্ম সম্যক্ প্রকারে গ্লানিত হইয়া পড়িল। তাই বুঝি যুগে যুগে যিনি এই সনাতন ধর্ম্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের সেই প্রাণদেবতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমরা দেখিতে পাই, প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই

বঙ্গ-ভারতের দিকে নানাশ্রেণীর সাধুমহাজনগণ আবির্ভূত হইয়া বেদবেদান্ত উপনিষদাত্মক সনাতন ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া দিয়াছেন। অবশেষে প্রভু জগদ্বন্ধুই হিন্দুধর্ম্মের সারাংশস্বরূপ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিভাগবতবাদ, তাহার মধুমঙ্গল বার্ত্তা ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রজ-গৌর লীলার মাধুর্য্য নির্য্যাস ছড়াইয়া তিনি বাংলা ভারতকে নবরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।

"হরিনাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই,
হের, প্রলয় এল প্রায়।
(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই (হরিনাম, প্রচার কর)"
"গরজে ররজ-রজঃ, রজবাণী নাই।
ভূমিকম্প ভবশঙ্কা ; বন্ধু কি পালাই॥
(আথকোয়েক্ হয় কেন, মা ?) (মহাপ্রলয় নিকটে মা !)
(কাল জল নাশ বটে) (যদি মা কীর্ত্তন বটে)
(তবে সৃষ্টি রক্ষা ঘটে) (আবেশে বাঁচায় বটে)
(কলিসংখ্যা পূর্ণ বটে) (পঞ্চসহস্রমাত্রে বটে)
(এই মাত্র সংখ্যা বটে)"
"মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা দয়া ধর্ম্ম দান উদ্ধার বিধান॥
(উদ্ধারণ ধর রে) (সবে হরিনাম দান)
(এই কল্যাণ বিধান)

(হরিকথার বিভিন্ন পদ)

কাতর করুণস্বরে এই সমস্ত যুগধর্ম্মের বাণীই তিনি প্রচার করিতেছেন। মানব জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগকে তিনি কলি ও সত্যের মহাসন্ধিক্ষণ বলিয়া জানাইতেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী কলিযুগের পরমায়ু যাহাই থাকুক না কেন, প্রভুর শ্রীমুখের বাণী অনুসারে আমরা বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারি, গৌরাঙ্গদেবের অবতারণের পরে কলি বিশেষভাবে ক্ষীণায়ু হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর কথায় কলিযুগের আর মাত্র পাঁচহাজার মাস অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর প্রভুর আগমনের সঙ্গে কলির আয়ুষ্কাল শেষ হইলেও, সত্য এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরন্তু কাল-কলি স্বাধিকার চ্যুতির আশঙ্কায় অনুচরগণের সহিত সৃষ্টিকে যে আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে।

বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতেই নিত্য সত্য গুণাকর প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে মহাপাপ-প্রপঞ্চ-প্রতীক তমোময় কলির প্রতিনিয়ত একটা বিপুল সংঘর্ষ চলিতেছে। একদিকে প্রভু অমোঘ শক্তিশালী হরি মহানাম মহাকীর্ত্তনের দ্বারা ধরিত্রীকে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। অন্যদিকে প্রলয় দানব দিন দিন অধিকতর পাপ প্রাবল্য ঘটাইয়া সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। প্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে প্রেমধর্ম্মের বিজয়ধ্বজাও যেমন সমুড্ডীন দেখিতে পাই, পক্ষান্তরে জীব-জগতের ভাগ্যাকাশে যে ক্রমেই একখানি

কালোমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে ইহাও আর বুঝিতে বাকী নাই।

পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য-নিকেতনে মহাকুরুক্ষেত্রের রণতাণ্ডব যেমন মানবজাতির প্রাণকে আজ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি মাধুর্য্য-কুঞ্জবনে শ্যামের মোহন মূরলীও বাজিয়া উঠিয়াছে। ঐ যেন তিনি মহালীলাগুপ্তি ভাঙ্গিয়া মোহসুপ্ত মানবকুলকে বিশ্বজনীন প্রেমের কোলে স্থান দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আচরাগত ধ্বংস প্রলয়ের বুকে নূতন সৃষ্টির পদচিহ্ন আঁকিয়া দিবার জন্যই তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা কবিতেছেন। স্বকীয় জগদ্বন্ধু নামের সার্থকতাকল্পে সমষ্টি জগজ্জীবের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি মোচনকেই তিনি জীবনের লক্ষ্যস্থানীয় করিয়া লইয়াছেন।

প্রভু রামবাগানের ডোম-পল্লীকেই পতিতপাবন লীলার কেন্দ্রভূমিরূপে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার কৃপার স্পর্শে তিনকড়ি ডোম সেখানে মূর্ত্ত দয়াশরীরী; হরি ডোম সেখানে করতালন-মৃদঙ্গনে জগদ্ধিত সাধনে ব্রতী, পীতাম্বর বাবাজী সেখানে আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ। ইহাদের ধূলিধূসরিত তনু ও প্রেমাশ্রু বিগলিত ভাব দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পড়িত। রামবাগানের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সরল ভক্তি-বিশ্বাসের প্রতীক ও দীন দৈন্য ভাবের আকর স্বরূপ ছিলেন।

রামবাগান মাহাত্ম্য

উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ দলে দলে যখন খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম হইয়া

যাইতেছেন, নব্য শিক্ষাভিমানীদের মধ্যে বিজাতীয়ভাবের অনুকরণপ্রিয়তা যখন অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, যখন হইতে মেয়ে পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ সমাজ জীবনকে কলুষিত করা আরম্ভ করিয়াছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পতাকাবাহী গোঁড়া সনাতনিগণ যখন জাত বাঁচাইবার জন্য নানা প্রকারের কুসংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ, ধর্ম্মের নামে যখন দিকে দিকে অধর্ম্ম ও অনাচারের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে; লোকশিক্ষাগুরু প্রকৃত ব্রহ্মণ্যদেব প্রভু আমাদের তখন পতিতোদ্ধারণ স্বভাবে সমাজ উপেক্ষিত ডোম-বুনাদের মধ্যে বাস করেন। তাহারাও যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ মানুষ, এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্য, তিনি তাঁহাদের হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন এবং "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ" শ্লোক সার্থকতায় তাঁহাদেরই প্রকৃত প্রণম্য করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রজ এবং নদীয়ামণ্ডলে গোপগোপী ও ভক্ত বৈষ্ণবগণ যেমন নিশি-দিন হরিনাম প্রেমে মাতোয়ারা থাকিতেন, আজ সমগ্র কলিকাতার মধ্যে ডোম-পল্লী রামবাগানেই ঐ মধুর আদর্শ প্রকট দেখিতেছি। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার কত পবিত্র ও নির্ম্মল, তাহা আজ এই রামবাগানের ডোম-পল্লীতে আসিলেই অনুভূত হয়। সুবিশুদ্ধ সত্ত্বঘন প্রেমময় প্রভুর ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানি দেখিবার জন্যও আজ এখানেই দলে দলে নরনারী ছুটিয়া আসে।

একদিন প্রভু এই রামবাগানে সেবক নবদ্বীপ দাসকে বলিয়াছিলেন, "এই জগতে যে যে কাজই করুক না কেন,

আমার শক্তি ছাড়া কেহই কিছু করিতে পারে না।" প্রভু যখন শেঠের বাগানে হর রায়ের ভগ্নিপতি যদু পালের বাসায় থাকিতেন, তখন তারকেশ্বর বণিক নামক এক গ্রাজুয়েট ভদ্রলোক প্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। রামবাগানেও ইনি প্রভুর সেবকরূপে অবস্থান করিতেন। রামবাগানে থাকার সময়েই প্রভু ত্রিকাল ও চন্দ্রপাত গ্রন্থ রচনা করেন। প্রভু বলিয়া যাইতেন, আর তারকেশ্বর লিখিতেন। চন্দ্রপাত রচনা হইবার পর প্রভু নবদ্বীপ দাসের দ্বারা এখানেই উহা প্রথম কীর্ত্তন করান। ১৩০৮ সালে মহাগম্ভীরার সূচনাও এই রামবাগান হইতে হইয়াছিল।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা

মধ্যে মধ্যে প্রভু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করিতেন। কোনসময় তিনি প্রভুর সেবার জন্য চম্পটী মহাশয়ের হাতে এক হাজার টাকা দান করেন। প্রভু ঐ টাকার দ্বারা খোল-করতাল, তুলসীমালা ও ভক্তিগ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া রামবাগানের ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। কালীকৃষ্ণ অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের উপাধি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। একদিন চম্পটী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কিছু বচসা হয়। চম্পটী মহাশয় কথায় কথায় কিছু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিলে, তিনিও অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিতে থাকেন, "কিসের প্রভু? এখনই আমি তাঁকে বাড়ীর বের ক'রে দেব।" তখন বাদল বিশ্বাস, রমেশ শর্ম্মা প্রভৃতি প্রভুর নিকট ছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিয়া

ভয়ে তাহাদের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র তাহার তর্জ্জন গর্জ্জনের কথা প্রভুকে জানাইলেন। ইতিমধ্যেই রুদ্রমূর্ত্তিধারী কালীকৃষ্ণ প্রভুর দিকে আসিতে লাগিলেন। সচরাচর প্রভুর দরজা খোলা নিষেধ থাকিলেও, তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। প্রভু তখন সর্ব্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় একটি মশারির নীচে শায়িত ছিলেন। কালীকৃষ্ণ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করামাত্র প্রভু বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলেন। তারপর অতি মধুরকণ্ঠে, 'কেরে ? কালীকৃষ্ণ।" এই বলিয়া একটি ডাক দিলেন। উহার প্রত্যেকটি বর্ণ তাঁহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। নিমেষের মধ্যে তাহার সকল রাগ গলিয়া জল হইয়া গেল। তিনি অশ্রুসিক্তনয়নে বলিলেন, "প্রভো! আপনার কথার ন্যায় এত মিষ্টি কথা তো আমি জীবনে আর শুনি নাই। একটি কথার দ্বারাই আমাকে আত্মসাৎ করিলেন। আমি মহাঅপরাধ করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন। যতদিন ইচ্ছা ততদিন আপনি এই বাগান বাড়ীতে থাকুন" এইরূপে নানা কাতর প্রার্থনার পর তিনি বিদায় হইলেন। ওদিকে প্রভুও আর ক্ষণমাত্র ওখানে অপেক্ষা না করিয়া রামবাগানে চলিয়া আসিলেন।

প্রভুর রামবাগানে অবস্থানকালে কতিপয় বারবনিতা অপূর্ব্বভাবে রূপান্তরিতা হইয়া সাত্ত্বিক জীবন যাপন আরম্ভ করেন। উহাদের মধ্যে সুরতকুমারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রধানত ইনি একজন ধনী জমিদারের রক্ষিতা

ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যুর পর তিনি ভোগলালসায় বিতৃষ্ণ হইয়া পড়েন এবং

সুবত কুমাবার কথা

পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনের জন্য যান। সেখানে চরণদাস বাবাজীর মুখে প্রভুর পতিতোদ্ধারণ লীলার কথা শুনিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্টা হন। ইতিপূর্বে রামবাগানেও তিনি প্রভুর কথা শুনিতেন বটে কিন্তু এমনভাবে কোনদিন উহা প্রাণস্পর্শ করে নাই। এইবার তিনি প্রভুর কৃপালাভের আশায় কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু প্রভু তখন কলিকাতায় ছিলেন না। কিছুদিন পর প্রভু বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া তিনি দর্শনের জন্য যাত্রা করেন কিন্তু পথি-মধ্যেই শুনিতে পান, "প্রভু ফবিদপুরে চলিয়া আসিয়াছেন।" তাই ক্ষুণ্ণমনে বৃন্দাবনে পৌছিয়া প্রভুব উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা নিবেদন জানাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রভুও তাঁহার ভক্তির আকষণে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় বৃন্দাবনে আসি-লেন এবং কেশীঘাটে লছ্মীরাণীর কুঞ্জে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাগলিনী মাতা প্রভুব আগমনের সংবাদ পাইয়া দর্শনেব জন্য ছুটিয়া আসিলেন। নবদ্বীপ দাসজী তখন প্রভুর সেবকরূপে সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার নিকট মনোবাসনা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার আকুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রভু নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখা দিবেন বলিয়া অপেক্ষায় থাকিতে বলিলেন। সুরমাতা তখন প্রভু কি কি খাইতে ভালবাসেন শুনিয়া সেই সেই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রত্যহই তিনি প্রচুর সেবার

দ্রব্য যোগাইতেন এবং প্রভুও উহার কিছু কিছু গ্রহণ করিতেন।

প্রতি প্রত্যূষে তিনি যমুনায় স্নান করিতেন। তিনি অঘাটে ও নির্জ্জনে স্নান করা অভ্যাস করিয়াছিলেন। একদিন তিনি স্নানের সময় দেখিতে পাইলেন যে. একখানি পাল্কী নদীর তীরে আসিল। ক্রমে উহাকে জলের মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইল। সুরমাতা সোৎসুক দৃষ্টিতে দেখিলেন. বিদ্যুদ্‌বরণ একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক পুনরায় উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রভু স্নান করিয়া ফিরিবার পথে হাসিতে হাসিতে সঙ্গী নবদ্বীপকে বলিলেন, "ওরে, সুরু আজ আমায় দেখে ফেলেছে।"

সুরমাতা কিন্তু ঐ মূর্ত্তি যে প্রভুর, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শেষে নবদ্বীপ দাসের নিকট আদ্যন্ত শুনিয়া "কেন ভাল ক'রে দেখ্‌লুম্ না" বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। ইহার পর প্রভু কয়েকদিন তাঁহাকে নানাভাবে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। তৎপর প্রভু বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তিনিও কলিকাতা ফিরিলেন এবং শীঘ্রই প্রভু রাম-বাগানে আসিবেন শুনিয়া তাঁহার জন্য পৃথক একটী ভাড়াটিয়া বাড়ী পরিষ্কার করাইয়া রাখিলেন আর মনে মনে যাহাতে তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন, এইরূপ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রভু নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় রামবাগানের ডোমপল্লীতে আসন

লইলেন। প্রভুর আগমনের সংবাদ শুনিয়া সুরমাতা যাহাতে তিনি তাঁহার নূতন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে যান, প্রকাশ্যে এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া সেখানেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ডোমভক্ত তিনকড়ি আসিয়া খবর দিলেন যে প্রভু তাঁহার নিজের বাড়ীতে গিয়াছেন। প্রথমে তিনি "আমার ন্যায় পতিতার বাড়ীতে প্রভু যাবেন কেন?" ভাবিয়া ঐ কথায় বিশ্বাস করিলেন না। শেষে সত্যই তিনি গিয়াছেন জানিয়া আনন্দমগ্নচিত্তে উন্মাদিনীর মত নিজবাটী অভিমুখে ছুটিলেন। গায়ের গরদের কাপড়খানা যে পথিমধ্যে কোথায় পড়িয়া গেল, তাহা টের পাইলেন না। তিনি আলুথালু বেশে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখেন প্রভু তাঁহারই শয়নের ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন! কিন্তু চম্পটী মহাশয় লোকসংঘট্ট আশঙ্কায় বাহির হইতে ঘর তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সত্যই দেখিতে দেখিতে সুরমাতার বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। প্রভু মাতাকে দেখিয়া একখানি কাগজে কয়েকটি সেবার দ্রব্যের নাম লিখিয়া দরজায় ফাঁক দিয়া উহা ফেলিয়া দিলেন। মাতা অবিলম্বে ঐ দ্রব্যগুলি কিনিয়া আনিলেন এবং কেমন করিয়া প্রভুকে দিবেন ভাবিতেছেন দেখিয়া প্রভু মধুরাতিমধুর স্বরে 'দরজার নীচ দিয়ে দাও' বলিয়াই চৌকাঠের নীচে হাত পাতিলেন। মাতা উহাতে উৎফুল্ল মনে প্রভুর হাতে এক একখানি করিয়া তিনখানি সন্দেশ দিলে, প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন। আর কোন দ্রব্য নিজে না গ্রহণ করিয়া ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিতে বলিলেন।

মাতা একটী গ্লাসে করিয়া জল আনিয়া প্রভুর শ্রীহস্ত প্রক্ষালনের ভাগ্য লাভ করিলেন। এইরূপে অপ্রত্যাশিতরূপে প্রভুর দর্শন স্পর্শন উভয়ই তাঁহার লাভ হইল দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহার ভাগ্যের শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। ইহার পর চম্পটী মহাশয় দরজা খুলিয়া দেওয়ামাত্র প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "আমি এখন যাব।" মাতা তাঁহাকে আরও কিছুক্ষণ থাকিবার জন্য কত কাকুতি জানাইলেন কিন্তু তাঁহার কথার কখনও নড়চড় হইবার উপায় ছিল না। মাতা তখন তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া শ্রীচরণের স্পর্শ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনিও স্মিতহাস্য সহকারে বরাবের পাদুকাসহ একখানি চরণ তাঁহার শিরোপরি ধারণ করিলেন। পুনরায় মাতা পাদুকাশূন্য পাদপদ্মের স্পর্শ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে, তিনি বলিলেন, "এই যথেষ্ট, এতেই যমযন্ত্রণা থাক্‌বে না। শুধু মৃত্যু হবে।"

এইরূপে প্রভুর কৃপাদীক্ষালাভের পর হইতে সুরমাতা দিবারাত্র হরিনাম জপ ও কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার সহিত আমরণ মহাউদ্ধারণ লীলার জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। প্রভু মধ্যে ইঁহার নিকট শ্রীহস্তে পত্র লিখিতেন। নমুনাস্বরূপ উঁহার একখানি পত্র আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীমতী ভরসা

গোরা—দাস্যেষু।

শ্রীশ্রীসুর—

তোমার কারুণ্যলিপিকা পাঠ করিলাম। সাক্ষাৎআদি করা বৃষভানুনন্দিনীর নিষেধ। সাক্ষাৎ হইবে না। ত্রিস্নান

করিও। নিত্য লক্ষ নাম কবিও। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিও। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মুখস্থ করিও। নিদ্রালস্য ত্যাগ করিও। স্ত্রী-পুরুষেব সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যাদি ত্যাগ করিও। চক্ষু, কর্ণে মনুষ্য বিষয় গ্রহণ করিও না। হবিষ্য করিও। লবণ-সৈন্ধবাদি ত্যাগ কবিও।

হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। স্বরূপদামোদবে আত্মসমর্পণ কবিও। গৌর-গদাধর ধ্যান করিও। মিলনাদি স্মরণে আবিষ্ট হইও। ....“বন্ধু”।

সুরতকুমাবীর প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কোন সময় হুগলী সহরের উপর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত দেখিয়া পুলিসের লোকে পলাতক আসামীবোধে প্রভুকে আটক করে। কিন্তু তিনি গোগৃহ ছাড়া আর কোথাও থাকিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে সহরস্থ একজন নাজিরবাবুর পাকা গোগৃহে রাত্রিতে বাহির হইতে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইল। পরদিন প্রভাতে দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে তিনি ঘরের মধ্যে নাই। তখন ঐ ঘটনা লইয়া সহরে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্রভু ধৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরমাতাকে তারযোগে নিজের অবস্থা জানাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে চলিয়া আসিবার জন্য দিয়াছিলেন। সুরমাতা ঐ সংবাদে অস্থির হইয়া রামবাগানের কয়েকজন ভক্তসহ হুগলী পৌঁছিলেন কিন্তু তৎপূর্ব্বেই প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। নাজিরবাবু আসামীর পলায়নে নিজেকে বিপদগ্রস্ত ভাবিয়া হা-হুতাশ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে

প্রভুকে আটক রাখার কথা

সুবনাত। তাহাব সহিত দেখা করিয়া প্রভুব পবিচয দিলেন। প্রভুব কৃপায তাহাব কোন অনিষ্ট হো হইবেই না ববং তাঁহাব মঙ্গল হইবে এই কথাও জানাইলেন। বাস্তবিকই ঐ ঘটনা আব অধিক দূব অগ্রসব হইল না এবং কিছু-দিনেব মধ্যেই উক্ত নাজিব বাবুব বেতন বৃদ্ধিসহ পদোন্নতি ঘটিল। হুগলীব এই ঘটনা উল্লেখ কবিয়া একদিন প্রভু ভক্তগণ সমক্ষে বলিযাছিলেন, "আমাব এটী অপ্রাকৃত দেহ। Time and spaceএব অধীন নহে।"

কলিকাতাব সুবিস্তৃত লীলা কাহিনী সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে আব অধিক আলোচিত হইল না। বর্ত্তমানে সংস্কৃত-কলেজেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবেন্দ্র নাথ দাশ

সুবেন দাশ গোবথা

গুপ্ত মহোদয়েব বাড়ীতে অবস্থানকালে, প্রভু তাহাব নিকট যে ভবিষ্যৎ বাণী কবিযাছিলেন, তাহা উল্লেখ কবিযাই আমবা কলিকাতা প্রসঙ্গেব উপসংহাব কবিতেছি। উক্ত দাশগুপ্ত মহোদযেব বাল্যজীবনে এক অদ্ভুত শক্তিব প্রকাশ হয়। আট বৎসব বয়স পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্ম দর্শনেব নানা জটিল প্রশ্নেব যথাযথ উত্তব দিয়া শ্রোতৃগণকে বিস্মিত কবিতেন। প্রভু তখন (১৩০১ সালে) চেতলাব বাজাবেব নিকটস্থ একটি মাঠেব মধ্যে একখানি পর্ণকুটীবে কিছুদিন বাস কবিয়াছিলেন। ঐ স্থান হইতেই তিনি কালীঘাট পুতুলুণ্ড লেনস্থ তাহাদেব বাড়ীতে যান এবং চাবিদিন একটি নির্জ্জন কক্ষে লুক্কাযিত থাকিযা নানাপ্রকাবে তাহাকে কৃপাব পবশ দেন। উহাব মধ্যেই একদিন প্রভু

কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কেবল মানুষ তরাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এবার আমি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি আপামর সমস্ত জীবকেই তরাব! এই জন্যেই আমার আগমন ঘটেছে।"

ঢাকায় প্রভু

১৩০১ সালের গ্রীষ্মকালে প্রভু সর্ব্বপ্রথম ঢাকায় আসেন। ভক্তবর রমেশাদি তখন মৌলভীবাজার বোর্ডিং হাউসে ছিলেন। প্রভুও উক্ত বোর্ডিএর একটি স্বতন্ত্র কক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানেও প্রভু দুই একজন ভক্তের সঙ্গে গভীর নিশীথে ভ্রমণ করিতেন। প্রভুর আগমনের কিছুকাল পরে ফরিদপুর হইতে ভক্তকুলমণি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সংকটাপন্ন অসুখের সংবাদ লইয়া নবদ্বীপ দাসজী ঢাকায় আসেন। প্রভুও ঐদিন শেষরাত্রে রমেশবাবু প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ফরিদপুর গমনের জন্য ট্রেণে নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে রওনা হন। প্রভু ফার্ষ্ট ক্লাসে এবং অন্যান্য ভক্তগণ থার্ড ক্লাসে যাইতেছেন। রাত্রি অবসান প্রায় দেখিয়া নবদ্বীপ দাসজী গাড়ীর মধ্যেই করতাল যোগে

প্রভাতীকীর্ত্তন আরম্ভ কবিলেন। তুমুলভাবে কীর্ত্তন চলিল এবং হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেল। কিন্তু গাড়ীর কোন কলকব্জা খারাপ হয় নাই এবং কেহ শিকলও টানে নাই। ড্রাইভার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি গাড়ী বন্ধ হইবার যুক্তি-

কীর্ত্তনেব শক্তি পবীক্ষা

যুক্ত কোনই হেতু খুজিয়া পাইলেন না। এদিকে রমেশবাবু নামিয়া প্রভুব নিকট আসিতেই, তিনি বলিলেন, "নবদ্বীপকে কীর্ত্তন বন্ধ কর্‌তে বল্। গ্যাসের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আত্মা আছে, তুমুল কীর্ত্তনে আত্মাগুলি উদ্ধাব হয়ে যাচ্ছে, কাজেই গ্যাসে কোন শক্তি প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছে না। গ্যাস জড় পদার্থ নহে, আত্মার সমষ্টি মাত্র।"

বমেশবাবু গিয়া নবদ্বীপকে প্রভুব কথা জানাইলেন এবং কীর্ত্তন বন্ধ করা মাত্র গাড়ীও পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর রমেশবাবু প্রভৃতি নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া প্রভুকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া ঢাকায় ফিবিলেন।

১৩০৫ সালের মাঘ মাসে পুনবায় প্রভুর ঢাকা গমনের ইতিহাসও অতি বিচিত্র। প্রভু ষ্টীমাবে নারায়ণগঞ্জ পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন, ঢাকার তৎকালীন নবাব ছলিমুল্লা সাহেবেব জন্য স্পেশাল ট্রেণ অপেক্ষা করিতেছে। নবাবের সঙ্গে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটাবী মিঃ জে, এল, গার্থ (J. L. Girth) মহোদয়ও আছেন। প্রভু তখন অসীম

ঐশ্বরিক তেজেব প্রকাশ

ঐশ্বরিক ভ্রুকুটি দেখাইয়া উক্ত স্পেশাল গাড়ীতেই উঠিয়া বসিলেন। নবাব ও তাঁহার

সেক্রেটারী প্রভুর অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও তেজপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহাদের আর সেই গাড়ীতে উঠিতে সাহস হইল না। এবং তাঁহারা ঐ গাড়ী যাহাতে প্রভুকে লইয়াই ঢাকায় পৌছিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই স্পেশাল ট্রেণ প্রভুকে লইয়াই ঢাকাভিমুখে রওনা হইল।

ঢাকায় পৌছিবার কয়েকদিন পরে প্রভু রামধন সাহার বাগান বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত সাহা মহোদয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপনের জন্য তিনি একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই প্রভু আসিয়া তথায় আসন লইলেন। সাহাজী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রভুর চিরসুন্দর মূর্ত্তিখানি দেখিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। প্রভু এই মন্দিরে থাকিবেন শুনিয়াও অন্তরটি তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

রমেশবাবু, কালিন্দীমোহন প্রভৃতি তখন নবাবপুরের একটী মেসে থাকিতেন। উহাদের নিকট প্রভুর কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র, সুধন্বকুমার ও প্যারীমোহন প্রভৃতি তাঁহার ভক্তরূপে পরিণত হন। ঢাকা নগরীকে প্রভু হরিনামের Capital (রাজধানী) ও "ধাম" আখ্যা দিয়াছেন। এইস্থানে তাঁহার বিচিত্র বহু লীলাদৃশ্যপট উন্মোচিত হইয়াছে। তাহার যৎ-কিঞ্চিৎ মাত্র নিম্নে আলোচিত হইল।

ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ডাঃ উষারঞ্জন মজুমদারের পরিবর্ত্তন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা। তিনি মিডফোর্ড হাসপাতালে সুধন্ব-

ডাঃ উষারঞ্জনের পরিবর্তন

কুমারাদির অধ্যাপক ছিলেন রামসাহার বাগানে একদিন সুধন্ব দেখিলেন, প্রভু মন্দিরের দরজা খুলিয়া শয্যার উপর বসিয়া আছেন। শরীর একেবারে খোলা। এইরূপ অভাবনীয়রূপে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া ভক্তবর কৃতার্থ হইলেন প্রভু তখন তাঁহার কত যেন অসুখ হইয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। সুধন্বকে দেখা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমার ছত্রিশকোটী ব্যাধি হয়েছে। শীগ্‌গীর ডাক্তার নিয়ে আয়।" ভক্তবর প্রভুর ব্যাধির কথা শুনিয়া ত্রস্তভাবে উষা-বাবুর কাছে গিয়া বলিলেন, "প্রভুর অসুখ হয়েছে। আপনাকে এখনই দেখ্‌তে যেতে হবে।" যদিও উষাবাবুর বন্ধুভক্তদের দেখিলেই নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করা অভ্যাস ছিল, তথাপি আজ তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, প্রভু দিগম্বর বেশে বালকের ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখামাত্র "ডাক্তার বাবু, আসুন, আসুন" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। উষাবাবু তখন প্রভুকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সুধন্বের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা এ কাঁহাকে দেখাতে এনেছ? এঁর পাল্‌স্‌ এর বিট্‌ নাই, হার্টএর সাউণ্ড নাই, অথচ বেশ কথা বল্‌ছেন।" প্রভু তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমাকে খুব ভাল ওষুধ্‌ দিন, আমার ছত্রিশকোটী ব্যাধি হয়েছে।" উষাবাবু কি ঔষধ দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ছাত্রকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঔষধ দিব, বল দেখি ?" সুধন্ব বলিলেন, "Stimulen Mixture" দিন। সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই তিনি বিদায় হইলেন। ঔষধ আনা হইল কিন্তু রমেশবাবু প্রভুর ভাব জানিয়া উহা আর খাইতে দিলেন না। ব্যাধির ভাণ দেখাইয়া উষারঞ্জনকে কৃপা করাই প্রভুর উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতও তাই হইল। সেইদিন হইতেই তাঁহার জীবনে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ক্রমশ তিনি হিন্দুধর্ম্ম তথা দেবদেবী ও অবতারে বিশ্বাসী হইয়া প্রভুর অন্যতম ভক্ত হইলেন।

কিছুদিন পর উষাবাবুর খুল্লতাত মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, তিনি তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইবার ব্যবস্থা করেন। সুধন্বাদি প্রভুর একখানি শ্রীমূর্ত্তি রোগীর শিয়রে বসাইয়া "জয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ, এস শ্রীগৌরাঙ্গ, চৌষট্টি মোহন্ত সনে" এই গান আরম্ভ করিলে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ

ব্রাহ্মদের কীর্ত্তনে নৃত্য

অর্থাৎ উষাবাবুর বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া দেখেন যে, একদল লোক 'গৌরাঙ্গ', 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নাচিতেছে। রোগীর কাছে ঐরূপ নৃত্যগীত তাঁহারা মোটেই পছন্দ করিলেন না। উঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্র নাথ মৈত্র, এম, এ, নামক ঢাকার তৎকালীন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ঘর হইতে একজন চশমাধারিণী বান্ধবী তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "লোকটাকে মেরে ফেল্‌ল। কানের কাছে অত চেঁচালে কি মানুষ বাঁচে ? বন্ধ কর, বন্ধ কর।" ইহার পর উঁহারা সকলেই কীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য সোরগোল

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তগণ তাহাতেও নিরস্ত হইলেন না। দেখিয়া, তাঁহারা জোর করিয়া কার্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন।

আরব্ধ কীর্ত্তনটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ভক্তদের প্রাণ যেন বিদরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ওকি ব্যাপার! কীর্ত্তন বন্ধ করা মাত্র রোগী 'বল শ্রীগৌরাঙ্গ' 'বল শ্রীগৌবাঙ্গ' বলিয়া চীৎকাব আরম্ভ করিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণ তাঁহাকে শান্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং ভক্তদের 'গাও, গাও' বলিয়া আদেশ জারী কবিলেন। কিন্তু ভক্তগণ উহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে রোগীর আর্ত্তি দেখিয়া পুনরায় তাঁহারা গান ধরিলেন। বোগীও অমনি চুপ করিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার দুইএক দিন পবেই উক্ত বোগীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ কবিবাব জন্য অনুরোধ জানাইয়া যান। উক্ত শ্রাদ্ধের দিনও ভক্তগণকে প্রভুর ভোগ-রাগ দিয়া প্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ কবা হইল।

সুধন্বকুমারাদিও নির্দ্দিষ্ট দিবস কীর্ত্তনসহ উক্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রভু-বচিত কীর্ত্তনগানই পর পব গীত হইতে লাগিল। অদ্যও উষাবাবুর ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়াছেন। আজ আবাব তাঁহাবা বৈরাগীদেব হৈ চৈ শুনিতে পাইলেন কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিদের আজ আর কার্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য বলিতে সাহস হইল না। এদিকে ক্রমেই কীর্ত্তনের শক্তি প্রকট হইতে লাগিল। ঢাকা কলেজিয়েট

স্কুলের তৎকালীন সেকেণ্ড মাষ্টার ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রজনীকান্ত ঘোষ আসিয়া প্রভুর আসনের নিকট বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। তৎপর ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন আচার্য্য চণ্ডীচরণ কুশারী মহোদয় কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের সমাজের বড় দুইজন নেতাই কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন, তখন তাঁহারাও একে একে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। উঁহাদের মধ্যে তৎকালীন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার ভুবন সেন মহোদয়ও ছিলেন। ইনিই এককালে ফরিদপুর জিলা স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রভুকে অন্যায় ভাবে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আজ তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র রচিত কীর্ত্তনগানে মত্ত হইয়া কৃতাপরাধেরই যেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ ব্যাপার দেখিয়া অতি উল্লাস সহকারে কীর্ত্তন করিতেছেন। বহুক্ষণ পর কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে রমেশবাবু ভুবন বাবুর সঙ্গে প্রভুর বিষয় আলোচনায় ব্রতী হইলেন। ভুবন বাবু প্রভুর বর্ত্তমান অবস্থার কথা শুনিয়া সভা মধ্যে —"ছোট বেলায় জগতের খুব ধর্ম্মভাব ছিল। আমি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তুম"—এইরূপ নানাকথা বলিতে বলিতে প্রভুর ফটোখানি হাতে তুলিয়া বহুক্ষণ নির্নিমেষে উঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ইহার পর ভক্তগণ যথারীতি প্রসাদাদি পাইয়া বিদায় হইলেন।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রভু

বাংলা ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পূর্ব্বে প্রভু গোয়ালচামটস্থ নিত্যানন্দ দাসের বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুটীর-কুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। ভক্তবর নবদ্বীপ দাস তাঁহার প্রধান সেবকরূপে কাছে ছিলেন। উক্ত সালের বৈশাখ মাসের এক অপরাহ্ণ কালে প্রভু নবদ্বীপকে সঙ্গে করিয়া যশোর রোড ধরিয়া সহরের দিকে যাইতে লাগিলেন। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের জীবন্ত বিগ্রহ প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। মুখখানি মাত্র খোলা রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে মৃদুমন্দ হাসির মধু বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলিতেছে। ক্রমশ দরবেশের পুলটি পার হইয়া একটী ঝাউ গাছের নীচে আসিয়া সহসা তিনি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ একখানি মাঠ। উহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বনঝোপ শোভা পাইতেছে। মাঠের মধ্য দিয়া সরু একটি পথ অদূরবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রভু ধীর পদবিক্ষেপে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ঐ ক্ষুদ্র পথ ধরিলেন এবং ক্রমশ নবকিশলয় দলে শোভমান ছোট্ট একটি চালিতা বৃক্ষ মূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার কথা॥

গোয়ালচামটবাসী প্রভু-পদাশ্রিত কুঞ্জবিহারী সরকার দূর হইতে তাঁহাকে এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিতে দেখিয়া



ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন

কৌতুহল পরবশ পশ্চাদনুধাবন করিয়াছিলেন। প্রভুর দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ায় তিনি ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, এ জায়গাটা কার?" কুঞ্জবিহারী উত্তর দিলেন, "রামসুন্দর ও রামকুমার মুদীর।" উহা শুনিয়া প্রভু তাঁহাদের ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। প্রভুর আহ্বানে মুদী ভ্রাতৃদ্বয় দ্রুতপদে আসিয়া চরণতলে প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের এ জায়গাটা আমাকে দিতে হবে আমি আঙ্গিনা করব।"

প্রভুর কথায় আনন্দ-উল্লাসে অধীর হইয়া তাঁহারা বলিলেন, "প্রভো! সে তো আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের কথা। আমরা এ জায়গা আপনাকে দান করলাম।" তৎপর প্রভু কুঞ্জবিহারীকে আদেশ করিলেন, "আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তুমি চার ভিটায় চারখানা ঘর তুলবে। আমি তোমাকে টাকা দিব।" এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই প্রভু কলিকাতায় গিয়া কুঞ্জবিহারীর নামে ৪০৲ চল্লিশ টাকা মনিঅর্ডার করেন। তিনিও যথারীতি প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া রাখিলেন। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিবস প্রভু তুমুল কীর্ত্তন উৎসবানন্দের মধ্যে আঙ্গিনায় আসন গ্রহণ করিলেন।

এই ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন হইতে প্রভুর কলিকাতাতেই অধিক যাতায়াত ঘটিত। শেষের দিকে মহাভাবোন্মাদ অবস্থায় বদরপুর, বাক্চর ও সহরস্থিত অন্যতম ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য ভক্ত বালকদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে যাইতেন। প্রভু শ্রীঅঙ্গনে আসিলে কেদার শীল নামক একটি

সরলমতি বালককে অনেক সময় কাছে কাছে রাখিতেন। ইহাকে প্রভু 'উপানন্দ' আখ্যা দিয়া আদর করিয়া "কাঙ্গা" (কাকা) বলিয়া ডাকিতেন। কাহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। প্রভুকে নিত্যই তিনি কীর্ত্তন শুনাইতেন। ইনি কীর্ত্তন করিবার সময় প্রভু নিজে মৃদঙ্গ বাজাইতেন। ইহার সহিতও প্রভু নিশীথে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণের সময় বৃক্ষগুলিকে দেখাইয়া প্রভু 'এ বৃক্ষটি শূদ্রবর্ণ', 'এটি বৈশ্যবর্ণ', 'এটি ব্রহ্মবর্ণ' এইরূপ বলিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কোন কোন দিন তিনি আপন মনে চাঁদের দিকে চাহিয়া স্বরচিত হরিকথার "রাসলীলা" আবৃত্তি করিতেন। কাহা তখন একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেন, মহাভাব-বিহ্বল প্রভুর সুবিমল গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে। উক্ত বৎসর শারদ পূর্ণিমা নিশিতে কাহা অন্যান্য ভক্তগণ সহ —

কেদার কাহার কথা

"আরত্রিক মিলিতাঙ্গ শ্রীরাসমণ্ডলে।
অবশ সখী সব নেহারে বিহ্বলে॥"

এই কীর্ত্তন করিবার সময় প্রভু শ্রীঅঙ্গন প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া ভক্তগণের নয়ন সফল হইল। প্রভু অন্য একদিন শুক্লপক্ষের গভীর রজনীতে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া শ্রীঅঙ্গন-রজেঃ দিগম্বর বেশে শয়ন করিলেন এবং বাহু উপাধানে মস্তক রাখিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ভাববিহ্বলভাবে দুই তিন ঘণ্টাকাল চাঁদের পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রভুর সেদিনকার নয়নমনোরঞ্জন

মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কাহা ধন্য হইয়াছিলেন। ইঁহাকে প্রভু বলিতেন, "হেলায়, শ্রদ্ধায় যে কোন প্রকারে নাম কর্‌বি। হরিনামের শক্তিতে অসাধ্য সাধন হয়। এটি ঘোর প্রলয় কাল। এ যুগে হরিনাম কীর্ত্তন ছাড়া সৃষ্টিরক্ষার আর কোনই উপায় নাই। এবার মানুষ তো মানুষ, দেখ্‌বি, রাস্তার ইট পাট্‌খেল পর্য্যন্ত হরিনামে নৃত্য কর্‌বে। হরিনামে, প্রেমে ধরা টলমল করবে।"

কাহা একদিন প্রভুর মন্দির সংলগ্ন চালিতা গাছটিকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া ছেদন করিতে যান। প্রভু তাহাতে বাধা দিয়া বলেন, "ওবে, ওঁটী কাটিস্ নে। উনি সাক্ষাৎ যোগমায়া। আমাকে আঁচলের তলে বক্ষা কর্‌ছেন।" ভক্তবর প্রভুর কথা শুনিয়া উক্ত বৃক্ষ ছেদনে নিবৃত্ত হন। কাহা প্রায়ই বলিতেন, "প্রভু আমার নির্ম্মল সুন্দর পুরুষ কিনা, তাই তাঁহার শ্রীমুখখানি চাঁদের মত ছিল। গাঢ় অন্ধকারেও তাঁহার ঠোঁট্‌দুটী পাকা তেলাকুচর মত রাঙ্গা টুক্‌টুকে দেখাত।" কাহার দেওয়া অন্নাদি সেবার দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিতেন। প্রথম জীবনে যেমন স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতা ও কঠোরতা দেখাইয়াছেন, আবার পরবর্ত্তী কালে ভক্তবাৎসল্যবশে সামাজিক বিধি নিষেধ তুচ্ছ করিয়া বিভিন্ন ভক্তদের পবিত্রভাবে আনীত অন্নাদি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

সময়ে ব্রাহ্মণেতর দরিদ্র ভক্তের আনীত আউসের অন্নও আদর করিয়া গ্রহণ করিতেন, আবার জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের

দেওয়া উত্তম আতপান্নও তিনি স্পর্শ করিতেন না। অবশ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার কোনই বিচার ছিল না। ভক্ত ব্রাহ্মণ ও ভক্ত শূদ্র উভয়কেই তিনি সমান প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। আচণ্ডালে প্রেমময় প্রভুর এইরূপ অপার করুণার কথা উল্লেখ করিয়া ভাগ্যবান প্রাচীন ভক্তগণ অদ্যাপি অশ্রুমোচন করিয়া থাকেন।

গোয়ালচামটে গৌরকিশোর সাহা নামক প্রভুর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বন্ধুকুণ্ডের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জমান অবস্থায় প্রভুর প্রথম দর্শন পান। ঐ দিনই প্রভু নানাবিধ মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার মন-প্রাণ আকর্ষণ করেন। সাহা মহাশয় প্রভুর সুদিব্য কান্তি দর্শনে ও তাঁহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যান। প্রভু তাঁহাকে তুলসীকণ্ঠি, নামাবলী, করতাল প্রভৃতি দিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচারে দীক্ষিত করিয়া তুলেন। ইঁহার চেষ্টায় গোয়ালচামটে একটি কীর্ত্তনের দল গঠিত হইয়াছিল।

গৌরকিশোর সাহার কথা

ইনি মধ্যে মধ্যে প্রভুর সেবার দ্রব্য দান করিতেন। এক দিন একটি কচি শশা আনিয়া দিলে প্রভু তাঁহার সম্মুখেই উহা গ্রহণ করেন। উহা দেখিয়া ভক্তবরের এত আনন্দ হইল যে তৎপর হইতে তিনি কচি শশা পাইলেই প্রভুর জন্য লইয়া আসিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবার আগ্রহে অকালেও তাঁহার নিকট শশা আসিয়া জুটিত।

"সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম" বাক্যটি প্রভুতে সর্ব্বা-

ঙ্গীনরূপে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। "মাটীর মত নীচ হও" "পৃথিবী ও তোমরা এক" ইহা তিনি শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জীবনে সম্যক আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। ধরিত্রী দেবী এবার সোনার প্রভু জগদ্বন্ধুর পাদপদ্ম দুইখানি বুকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। ক্ষুদ্র জীব কি করিয়া ঐ অপূর্ব্ব পরশমণির লীলা রহস্য ধারণা করিবে ?

খঞ্জন গতিতে প্রভু যখন নয়নমনোমোদভাবে কীর্ত্তন ক্রীড়ারঙ্গে চলিতেন, তখন ঐ লীলাকৌতুকীর করুণ চাহনিতে এমনই মাধুরীধারা উছলিয়া উঠিত যাহাতে ক্ষিতি, ক্ষিতি ছাড়িয়া অপ্ বা আনন্দ সলিলে ভাসিয়া বেড়াইত। আবার যখন প্রভু মন্মথ মন্মথরূপে মন্দাকিনীমোদ পদ্মার সলিলে পদ্মাসন রঙ্গে ভাসিতেন, তখন সেই চন্দ্রভাল রমণ মহাতেজ চৈতন্য সুন্দরের ভানুকোটী উজ্জ্বল রূপের ঝলক জাগতিক সকল সৌন্দর্য্যকেই পরিম্লান করিয়া তুলিত। গৌরকিশোর প্রভুর রূপলাবণ্য রসে এমনই নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে 'প্রভুকে কখন্ দেখিবেন' সতত তাঁহার অন্তরে এই বাসনা জাগরূক থাকিত।

একদিন অমাবস্যার রাত্রে প্রভু তাঁহাকে বাড়ী হইতে কিছু অন্নভোগ আনিতে আদেশ জানান। কিন্তু ভক্তবর অন্ধকার রাত্রে একাকী বাড়ী যাইতে ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া প্রভু সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আজ অমাবস্যা নয় পূর্ণিমা।" সরল বিশ্বাসী গৌরকিশোর প্রভুর কথার কোন উত্তর না করিয়া নত শিরে প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, "আমার ভাগ্যের আর সীমা নাই। কত রাজভোগ

প্রভু নিজে গ্রহণ না করিয়া কাঙ্গাল গরীবদের বিতরণ করেন, কত অট্টালিকাবাসী ধনী মহাজন যে প্রভুর পর্ণকুটীর প্রাঙ্গণে আকুল প্রাণে গড়াগড়ি যায়, সেই প্রভু অযাচিত ভাবে আমার মত পতিত-পাপীর কাছে কয়েকদিন পূর্ব্বে অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেকে আমি অনধিকারী বোধে প্রভুর কথা রক্ষা করি নাই। আজ আবার আমাকে ঐ সেবার দ্রব্য আনিতে বলিতেছেন। তিনি যখন নিজে চাহিতেছেন, তখন না দিলেও তো অপরাধ হবে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাড়ী যাইয়া নূতন পাত্রে করিয়া ঘৃতসিক্ত আতপান্ন লইয়া শ্রীঅঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীঅঙ্গনের পশ্চিমদিকে যে জলাশয়টি বন্ধুকুণ্ড নামে অভিহিত, উহার অপরপারে গৌরকিশোরের বাড়ী। সে সময় স্থানটি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হওয়া নিরাপদজনক ছিল না। বিশেষত এতদঞ্চলের তখনকার সাধারণ মেয়ে পুরুষেরা প্রেত-পিশাচের ভয়ে সতত জড়সড় থাকিত। অধিকন্তু যেস্থানে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা এককালে মহাশ্মশান ছিল।

গাঢ় অন্ধকার নিশীথে গৌরকিশোর বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র আকাশে কালো কালো মেঘের কোলে তারার মালাগুলি লুকাইয়া পড়িল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ভক্তবর গৌরকিশোর অনেকটা নির্ভীকচেতা ছিলেন। নিশি সময়ে শ্রীঅঙ্গনে আগমনেচ্ছুক

ভক্তগণের প্রতি আলো ও লাঠি ব্যবহার করা নিষেধ ছিল। প্রভু কি উদ্দেশ্যে কি করিতেন তাহা সহসা বোধগম্য হইত না। তবে প্রতি কার্য্যেই যে তিনি ভগবানের প্রতি অসীম নির্ভরতা শিখাইতেন এবং সৎসাহস, অহিংসা ও পবিত্রতার বলে বলীয়ান্ হইতে বলিতেন, ইহা তাঁহার ব্যবহারিক শিক্ষা দীক্ষার মধ্যেই পরিস্ফুট ছিল।

ঘন অন্ধকারেব মধ্যে পথ চলিতে চলিতে গৌরকিশোরের মনে সহসা প্রভুর সেই শ্রীমুখবাক্য 'আজ অমাবস্যা নয় পূর্ণিমা' মনে পড়িয়া গেল। এদিকে তিনি দরবেশের পুলের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ সম্মুখপানে চাহিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, শ্রীঅঙ্গন হইতে উক্ত সেতু পর্য্যন্ত সার্চ্চ-লাইট অপেক্ষাও শতগুণে উজ্জ্বল অপূর্ব্ব এক জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে হৃদয়খানি তাঁহার নাচিয়া উঠিল। তিনি হতবিহ্বল ভাবে দাঁড়াইয়া ঐ পূর্ণচন্দ্র নিন্দিত জ্যোতিঃবাশি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় "গৌরকিশোর এসেছিস্" প্রভুর এইরূপ সুধামাখা কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঐ অপ্রাকৃত আলোকমালা অদূরে দণ্ডায়-মান প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতেই বিনির্গত হইতেছে। তখন তিনি ত্বরিদ্‌বেগে তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অপার্থিব রূপের ঝলক ও অমানুষিক ঐশ্বরিক তেজ দেখিয়া ভক্ত হৃদয়ে তখন আনন্দের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। প্রভু শ্রীকুণ্ড তীরস্থ ঝাউগাছ তলায় দাঁড়াইয়াই

তাঁহার আনীত সেবার দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। সেদিনের ঐ মধুর স্মৃতি আমরণ তাঁহার অন্তরে গাঁথা ছিল।

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠার পর টেপাখোলাবাসী মথুরা নাথ কর্ম্মকার নামক একজন ভক্ত প্রভুর বিশেষ কৃপালাভ করেন। বদরপুরে বাদল বিশ্বাসজীর বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথ দিয়া ইনি প্রথম প্রভুর দর্শন পান। তৎপূর্ব্ব হইতেই তিনি ভক্তি ভাগবত চর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহার মনে অপার আনন্দের উদ্রেক হইত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা ও রূপগুণের কথা স্মরণ হইলেই, ইহার মনে প্রভুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। ইহাকে প্রভু শ্রীহস্তে লিখিয়া আদেশ উপদেশ দিতেন। একদিন এক খণ্ড কাগজে তাঁহাকে লিখিয়া দেন, "প্রভুর বারটি নাম উচ্চারণ করিবে ঃ—

মথুর কর্ম্মকারের কথা

১।	হরি	৫।	ঈ	৯।	হিঁ
২।	মহাউদ্ধারণ	৬।	আ	১০।	উ
৩।	পুরুষ	৭।	ঊা	১১।	উ
৪।	জগদ্বন্ধু	৮।	ঈী	১২।	অ •

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম সম্প্রদায়ের ব্লকের ভিতর প্রভুর এই দ্বাদশ নাম সন্নিবেশিত আছে।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসিবার পর সহরের অনেক স্কুল কলেজের ছাত্র প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদিগকে তিনি মধুর ভাবে নানা আদেশ উপদেশ দিতেন। ভক্তিধর্ম্মের আদর্শ অনুরূপ তাহাদের জীবন গঠনের প্রচেষ্টা পাইতেন।

১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে বালকদের মধ্যে একজন আশানুরূপ প্রভুর দর্শন না পাইয়া আবেগের সহিত নিবেদন জানাইয়াছিল, "প্রভো! ওরূপ ঘরে বন্ধ না থেকে বের হও। তোমাকে দেখে সকলে সুখী হোক্।" প্রভু ঐ কথার উত্তরে গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "ওরে, আমি কার কাছে বের হব? আমায় চায় কে? কেউ তো আমার কথা শুন্‌ল না। আমার জন্য কষ্ট স্বীকার ক'রে কেউ হরিনাম কর্‌তে চায় না। আমি তো সবকেই কাছে রাখ্‌তে চাই। কিন্তু সবাই কর্ম্মদোষে দূরে স'রে যায়। ওরে, আমি সব বুঝি। আমার চোখে ধূলি দেয় এমন সাধ্য কারো নাই। বিকারী রোগীকে ঔষধ দিলে তো কোন ফল হয় না। কাল, কলি, পাপ, প্রপঞ্চ ও প্রাক্তন বশে জীব দুঃখ পায়। হরিনাম করে না, আমারও কথা শুনে না। হিত বল্‌লে অহিত বোঝে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় ব'লতে লাগিলেন, "এখন আমি ঘরে ঘরে এত সেধে বেড়াচ্ছি, কেউ হরিনাম কর্‌ল না। তোরাও আমার কথা শুন্‌লি না। এই প্রায় ত্রিশ বছর দেখ্‌লি, বিশ্বাস কর্‌লি না। দেখ্‌বি, এমন দিন আস্‌বে, যেদিন আমার একটা কথা শুন্‌বার জন্য কাঁদ্‌বি। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ঘিরে থাক্‌বে। হরিনামে, প্রেমে ধরা টল্‌মল্ কর্‌বে। মনে রাখিস্, আমার হাত কেউ এড়াতে পার্‌বে না।"

বালক ভক্তগণের কথা

উক্ত ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রভু অত্যন্ত খোলাভাবে বালক ভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া আদেশ

উপদেশ ছলে বহু বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বাণীগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা—"তোমরা সবাই ভাব্‌ছ, আমার সঙ্গী হবে। ওবে, তা হবে না। তোরা সব দুনিয়ার মহাপাপী, স্রোতের তৃণের ন্যায় ভেসে যাচ্ছিলি, আমি ধরেছি ব'লে আছিস্। কাল, কলির প্রবঞ্চনায় ভুলে আমায় হারায়ে যাস্ নে। নিজের দিকে চেয়ে দেখিস্, তোরা কি! যখন আমায় সবাই চাইবে, তখনই আমি বের হব।"

"সময়ে এমন সব লোক আমার কাছে আস্‌বে, তোরা দেখে অবাক্ হয়ে যাবি। তাদের হরিনামে বিশ্বাস-ভক্তি অটল থাক্‌বে। তারা ভুবনমঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌বে। দিনরাত হরিনামে মেতে থাক্‌বে। তোরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাদের দিকে চেয়ে থাক্‌বি। তোরা আর তারা, সমুদ্রের এপার আর ওপার তফাৎ।"

"সকলেই আমাকে সাধু সন্ন্যাসী ভেবে নানাভাবে পরীক্ষা করে। সবাই চায় ইন্দ্রজাল। কেউ ছেলে নিয়ে এসে বলে, 'পির্‌ভু! ও পির্‌ভু! একটু ওষুদ দেন। ছেলেটার বড় ব্যম।' আমি কিছু না বল্‌লে অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়ে মানত ক'রে যায়। ছেলে ভাল হ'লে মহোৎসব দেয়। কেউ বলে, 'দেনা হয়েছি; টাকা দাও।' কেউ বলে, 'আমার ব্যবসায়ে উন্নতি হোক্।' কেউ বা সংসার সুখ চায়। যা'র যে ভাব, সে তাই চায়। আমি তো সকলকেই সব দিয়েছি। দেখ, এত সব চায় কিন্তু হরি নামে রুচি হোক্, উদ্ধারণ চাই, তা কেউ বলে না। কেবল পরীক্ষা। কেবল ফাঁকী। ইন্দ্রজালে পৃথিবী ঘিরে ফেলেছে।

হায় ! হায় ! এই পাপের সংসারে হরিনাম প্রচার করা বড়ই কঠিন। মানুষ কেবল হুজুক্ চায়, হৈ চৈ ভালোবাসে। তোমরা হুজুক্ করো না। ধীরে, অতি ধীরে, মহাপ্রেমে, নিষ্ঠার সহিত চলে যাও। হতাশ হয়ো না। আমি আছি, ভয় কি ? হরিনামে নিষ্ঠা রেখে, নিত্যানন্দে লক্ষ্য ক'রে চলো। লোক সব তোমাদিগকে জটিল পথে লইতে চাইবে। কিন্তু তোমরা কর্ত্তব্য ছেড়ো না। এই পতিত সংসারে কাম প্রেম ব'লে বিকাচ্ছে। এই তো মহাহুজুক্ ! কেবল ফাঁকি। আত্মপ্রবঞ্চনা। তোমরা পদে পদে সাবধান থেকো। দিনান্তে একবার আমাকে স্মরণ করো। তুলারাশিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পাপ তাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

ঐ সময়ে প্রভুর প্রেম-লাবণ্যভরপুর মধুমাখা মূর্ত্তিখানি দেখিয়া বালকগণের হৃদয় অতুল আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিত। তাঁহারা সকলেই মনে করিতেন, "বন্ধু আমায় সব চেয়ে বেশী ভালোবাসেন।" প্রভুর কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা আত্মহারা হইয়া যাইতেন। 'বন্ধু' বন্ধু' বলিয়াই প্রভুকে তাঁহারা ডাকিতেন। প্রাণসখার মতই প্রভুকে তাঁহারা ভালবাসিতেন। অনেক সময় প্রভুর দেখা না পাইয়া তাঁহারা নিতান্ত আকুলতার সাথে প্রার্থনা, নিবেদন জানাইতেন। উহাতে দেখা যাইত, কোন কোন দিন আকস্মিক ভাবে প্রভু তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন কখনও বা কাহারও বাড়ীর পাশ দিয়া যাইবার সময় বেড়া ঠক্ ঠক্ করিয়া তাঁহার গমনবার্ত্তা জানাইয়া দিয়াছেন। কোন কোন দিন বা দূর হইতে ইঙ্গিত করিয়া

ছুটিয়া আসিতে আদেশ করিয়াছেন। প্রভুর এইরূপ অসীম করুণার পরিচয় পাইয়া আশ্রিত বালকের দল অবাক হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের মনে সতত আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত।

প্রভু যেমন একদিকে কুসুম হইতেও কোমল ছিলেন, তেমি কর্ত্তব্যের দিক্ দিয়া তাঁহাকে কঠোর হইতেও সুকঠোর হইতে দেখা যাইত। আশ্রিত বালকদের তিনি বলিতেন, "আমাকে যদি চাও, তবে তোমরা সুখের আশা করো না। আমার জন্য অনেক কষ্ট সইতে হবে। লোকে পাগল, মত্‌লবি বল্‌বে। গায়ে ধূলা দিবে। চোর, লম্পট বলে গাল দিবে। কত যন্ত্রনা কর্‌বে। সব ছেড়ে আমার পিছনে পিছনে বনে-জঙ্গলে ঘুর্‌তে হবে। খেতে, শুতে, ঘুমাতে পার্‌বে না। তার চেয়ে ঘরে ফিরে যাও, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে।"

প্রভুর ঐ শেষোক্ত কথায় বালকদের প্রতিভূ স্বরূপ একজন বলিয়াছিলেন, "আমরা সুখ চাই না, সংসার চাই না। বিষয় সম্পত্তির কামনা করি না। শত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমরা তোমাকেই চাই।" তাঁহাদের মনের দৃঢ়তা দেখিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা নিত্য চিরকাল আমার। আমি তোমাদিগকে রক্ষা কর্‌বো। চিন্তা করো না। তোমরা আমার জন্য সবই সইতে পারবে।"

"তোদের উপর দিয়ে ঝড়ের মত সব দুঃখ যন্ত্রনা বয়ে যাবে কিন্তু কেউ তোদের কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। তোমরা সবাই হরিনামের বল বাঁধ। নিয়ম নিষ্ঠায় থাক। আমি ভিন্ন

একুলে ওকুলে তোদের আর কেউ নাই। এইকথা ধরাধামে একমাত্র আমিই জানি। তোবা আমায় স্মরণ করিস্ আর নাই করিস্, আমি নিত্যকাল তোদিগকে স্মরণ করবো। তোমাদের গতি অহং, কহিলাম সত্য কথা,একথা নহে অন্যথা।"

"তোমরা সময় থাক্‌তে থাক্‌তে হরিনাম কর। গায়ের বক্ত জল করা অভ্যাসটি ছাড়িও। কেহ গায়ের রক্ত জল ক'রে আয়ু ও বংশ নষ্ট করো না। এই আমাব শপথ।" *

বালকগণের প্রতি প্রভু প্রদত্ত এইরূপ ভুরি ভুবি উপদেশ বাণী বহিয়াছে

ঐ সমস্ত মধুমাখা উপদেশ ও তাঁহাব পবিত্র লীলাকথা যাহাতে প্রচারিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন হয়, সে সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "একালে, ওকালে, ত্রিকালে, নিত্য চিরদিন নির্ভয়ে, যেখানে সেখানে আমার কথা ব'লে বেড়াবি। আমাব উপদেশ, আমাব রচনা, আমাব কথা প্রচার কর্‌বি। আমি তো ঝুটা মাল নই যে বল্‌তে ভয় কর্‌বি। মেটে হাড়িও লোকে বাজায়ে কিনে। আমায় বাজাতে ছাড়্‌বে কেন? পৃথিবীর সকলকে বলো, মহামহাজ্যোতিষী দ্বাবা আমার বিষয় গণনা করায়ে দেখে, সত্য হলে যেন আমায় গ্রহণ করে, নইলে দূরে পরিহার করে।"

আর একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বলি, তাহা

---

* শ্রীশ্রীপ্রভুর সুমধুর উপদেশাবলী "**শ্রীশ্রীবন্ধুবেদবাণী**" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ফবিদপুব, মোহন লাইব্রেরী ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মন দিয়ে শুন। আমি যাহা লিখি, তাহা মন দিয়ে পড়ো। চিঠির মত পড়ো না। মুখস্থ ক'রে রেখো। সদাকাল আমার কথা অনুশীলন করো। আমি যাহা বলি, তাহা চিন্তা করো। আমি যাহা বলি, তাহা বিচার করো। আমি যাহা বলি, তাহা নিত্য চিরকাল প্রচার করো।"

"আমায় সদাকাল দেখে চলো। হরিনাম নিষ্ঠা ও পবিত্রতার বল বাঁধ। তবেই তোমাদের মঙ্গল। আমার কথায় কাজ করলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা। আমার কাজ বহুকালব্যাপী ধরাধামে বিদ্যমান থাক্‌বে। সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমার লীলা চল্‌বে। তোমরাঃ আমার নিত্য সত্য অভিভাবক। তোমরা হরিনাম ক'রে আমায় পালন করো।"

এইরূপে প্রভুর সকল আদেশ উপদেশের মধ্য দিয়া হরিনামের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইত। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যে হরিনাম সংকীর্ত্তন, ইহাই ঘোষণা করা তাঁহার অন্তরের সাধ ছিল। তাঁহার সমগ্র আদেশ-উপদেশের ও পাবনী লীলার সম্যক্ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরি লীলামৃত" গ্রন্থে প্রাণ ভরিয়া প্রভুর লীলাকথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে।

প্রভুর বৈশিষ্ট্য
ও
প্রেমধর্ম্ম প্রচারণ

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রভু অনর্গলভাবে নানা মধুর উপদেশে ভক্তগণের মনপ্রাণ স্নিগ্ধ রাখিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মন্দির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়াই কথা বলিতেন। রাত্রিকাল ভিন্ন প্রায়ই বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। প্রভুর প্রেম-প্রীতি

ও স্নেহ-আদর অসামান্য ছিল। অনর্ব্বচনীয় ঐ রূপমাধুর্য্য আস্বাদনের লালসা ভক্তগণকে সততই পাগলপারা করিয়া রাখিত।

জীবদুঃখে প্রভুর কাতরতা ও আত্তির কথা স্মরণ করিলে ঐ চরণে মস্তক স্বতই নমিত হইয়া পড়ে। মহাভাবের কনক চূড়ায় সমারূঢ় থাকিয়াও তিনি পতিত জীবের সঙ্গে মিশিতেন। শ্রীমুখে যখন যাহাই উচ্চারণ করিতেন, তাহাই অতি মধুর শোনা যাইত। কেবলমাত্র একটিবার তাহার দর্শন লালসায় নবনারীকুল আকুল হইয়া শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসিত। কিন্তু বিশেষ ভাগ্যবান ব্যতীত কেহই উন্মুক্ত দরজায় তাঁহার দর্শন পাইত না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিয়াছেন,—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

প্রভুর লোকোত্তর জীবনের ভিতর দিয়া এই মহাজন বাক্যই সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। হরিনামে অনুরাগী, ভক্তিধর্ম্মে আস্থাবান, সরল সুন্দর ভাবাধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা অতি সহজে প্রভুর করুণার পরশ পাইতেন। পক্ষান্তরে চঞ্চলতা, চপলতায় পূর্ণ, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র, অসংযমী ও ইন্দ্রিয় সেবাপরায়ণ বহু ব্যক্তির জীবনেও তিনি সাত্ত্বিক রূপান্তর আনিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন 'অদোষ দরশী'। পূর্ব্বের ভাব যাহাই থাকুক্ না কেন, একবার যদি কেহ সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার করুণা যাচ্ঞা করিতেন, তাঁহাকেই তিনি স্নেহের কোলে তুলিয়া লইতেন। এইরূপে বহু চরিত্রহীন বালক ও যুবকের জীবনের

গতি তাঁহার আদেশ অনুবর্ত্তিতায় অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সুমহান আদর্শবাদে 'পাপই ছিল ঘৃণার বস্তু—পাপাচারী নয়।' পতিত পাপীকুলের দুর্গতি দেখিয়া প্রাণটি তাঁহার সদাই কাঁদিত। তাইতো, হরিকথা, চন্দ্রপাত, ত্রিকাল প্রভৃতি স্বরচিত গ্রন্থে পরমদয়াল ও পতিত-পাবন স্বভাবের তিনি অত্যুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রভুর গ্রন্থাবলী একদিকে কাব্য সাহিত্য জগতে যেমন অপূর্ব্ব অবদান, অন্যদিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবসম্পদে পূর্ণ। ভক্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তিনি জীবের জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তাহা পাঠে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার জগতে আগমনের সত্যিকার উদ্দেশ্যই হইতেছে, জীবকুলের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার চির অবসান ঘটাইয়া তাহাদিগকে নিত্য নিরুপম সুখ সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া তোলা।

প্রভুর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষ, দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষের জন্য নহেন। "জগদ্বন্ধু" যে নামটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, সমস্ত জগতের সঙ্গেই তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কাম কামনাসঙ্কুল এই চঞ্চল জগতের মধ্যে প্রভুর জীবন দর্পণখানির ন্যায় স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল ভাবের খনি সত্য সত্যই সুদুর্ল্লভ। ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রজাল ও ফাঁকিবাজীতে ভরা জগতের মধ্যে প্রভু সত্য সৌন্দর্য্য ও প্রেম মাধুর্য্যের প্রকট বিগ্রহ।

যে জাতির মধ্যে সেদিন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, আজ আবার যেখানে সাক্ষাৎ প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর প্রকট হইয়াছেন, সেই বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জ্বল, এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কালবিপর্য্যয়ে সে জাতির আজ যতই দুর্গতি ঘটুক্ না কেন, তাহার সন্তানগণই এবার বিশ্বজীবনিবহকে প্রেমধর্ম্মের অভিনব আলোকের সন্ধান দিবে। জগজ্জাতি নিচয়ের যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত গ্লানি গলদ দূর করিবারও তাহারা উপায় নির্দ্দেশ করিবে। বিশ্ববাসীকে সত্যিকারের আনন্দ-অমৃতের আস্বাদন পাইতে হইলে প্রেমভূমি এই বঙ্গভূমির দুয়ারেই ভিক্ষার আঁচল পাতিতে হইবে। হরিনাম ও রাধাপ্রেমের অমিয় মন্দাকিনী ধারা যে দেশের ভিতর দিয়া তর্ তর্ বেগে বহিয়া যাইতেছে, সেই বাংলা দেশ যে সত্য সত্যই বিশ্ব জগতের মাথার মনি, অচিরেই তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালীর দুঃখ-দৈন্য ও জাড্যতা-আবিলতা ভাসাইয়া লইবার জন্য আজ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গুপ্তলীলার যে উদ্দাম স্রোত বহিতেছে, কাল তাহাই কল-কল্লোলিনী গঙ্গার শতমুখী ধারা বঙ্গে দৃষ্টিগোচরে আসিবে। বাঙ্গালীকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিবার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা উনবিংশতি শতাব্দীর শেষাংশ হইতে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সন্ধান এখনও দেশবাসী পায় নাই। বাঙ্গালীর সুদিব্য জাতী-

য়তা ও কৃষ্টি-সভ্যতার নিগূঢ় কথা প্রভুর বাণীর ভিতর দিয়া আমরা অতি অভিনবরূপে জানিতে পারি।

আমরা যদি প্রভুরচিত "ত্রিকাল" নামক বঙ্গভাষার অদ্বিতীয় সূত্র গ্রন্থখানির সম্যক্ পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, ঐ গ্রন্থে শুধু তিনি ধর্ম্মনীতির কথাই বলেন নাই পরন্তু স্বদেশ, স্বজাতি তথা ভারত-জগতকে চিরশান্তিনিলয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধার্ম্মিক প্রভৃতি যত প্রকার সমস্যার সুসমাধান প্রয়োজন, তাহার অনেক কিছুই তিনি উক্ত গ্রন্থে এবং অপরাপর শ্রীমুখবাক্যে অপরিসীম ভাব ব্যঞ্জনাসহ অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতের স্থায়ী উন্নতি-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক যে একমাত্র প্রেমধর্ম্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে অবিশ্বাস, এই কথাই প্রভুর দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষনীয় বিষয় ছিল। জীবের প্রাণদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের পর নিখিল ভারত-জগতিতলে প্রভু জগদ্বন্ধুর ন্যায় প্রকৃত অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চর্য্যা ও প্রেমের প্রভাব আর কেহই বিস্তার করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের বিরাটত্ব ও ঐশ্বর্য্যদ্যোতক ভাবগুলির ধারণা মানব মনের সম্মুখে বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহাকে যে প্রাণের জন, ভালবাসার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহা অনুধাবনা করিয়াই তিনি ভগবানের জীবদুঃখকাতর, পরম করুণাঘন, প্রেমময়স্বরূপের ছবিখানি অনুগত ভক্তদের প্রাণপটে আঁকিয়া দিতেন।

প্রথম জীবনেই তিনি অনুগৃহীতদিগকে কীর্ত্তন-প্রার্থনা

শিখাইয়াছিলেন, "এস এস নবদ্বীপ রায ; দীনজন ডাক্‌ছে হে তোমায়। আমি ভবঘোরে ঘুরে ঘুরে আচ্ছন্ন মোহমায়ায়॥" অথবা "ঐ শ্যামরায, ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়ায়ে কদম্ব তলায় রে।" ইত্যাদি। এইরূপে তিনি গোলোকবিহারী শ্রীহরির বৃন্দাবন ও নদীয়া লীলার মধুরাতিমধুর দৃশ্যগুলিই জীব-জগতের মানস-নয়নে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা পাইতেন।

এই সংযম, ব্রহ্মচর্য্যহীন দুর্ব্বলচিত্ত যুগজীবের পক্ষে যোগ-মার্গের কঠোর অঙ্গগুলির যথাযথ যাজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে যে সফলকাম হওয়া সুদূরপরাহত, উহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াই তিনি বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের সহজ অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিতেন। হরিনামের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করাই তাঁহার সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য ছিল। সংকীর্ত্তন ছিল তাহার প্রাণবস্তু স্বরূপ। সংকীর্ত্তনেশ্বর গৌর বিনোদিয়ার মত সতত তাঁহাকে মহাভাব সমাধিতেই মগ্ন থাকিতে দেখা যাইত।

গৌর সুন্দরের রূপ যে কত মধুর ছিল, তাহা প্রভু জগদ্বন্ধুকে যাহারা ক্ষণিকের দেখাও দেখিয়াছেন, তাহারাই কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। অমন সুগৌর-কান্তিশ্রী সমুজ্জ্বল, সুকমণীয় সুন্দর পুরুষ, অমন নিটোল সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অমন প্রেম লাবণ্যময় অপ্রাকৃত মহাভাবের দেবতা যে সত্যই আর হইবার নয়, ইহা একবাক্যে স্বীকার্য্য।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে অবস্থিত হইবার পর নির্দ্দিষ্টরূপে

প্রভুর সেবা-পরিচর্য্যার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু আশপাশের গ্রামগুলি হইতে নিত্য নানা-প্রকার সেবার সামগ্রী শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া স্তূপীকার হইত। উহাদের অধিকাংশই তিনি সমাগত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। নিজে সামান্য ফল-মূলাদি বা কোন ভক্ত আনীত অন্নাদিও যৎসামান্য গ্রহণ করিতেন। শ্রীমন্দিরের দরজা কখনও খোলা রাখিতেন না। ক্রমে ক্রমে আদেশ উপদেশ দান ও দর্শনাদি দান কমাইতে লাগিলেন। দিন দিন উন্নত উজ্জ্বল মহাভাবের লক্ষণগুলিই তাঁহাতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মহাভাবনির্ব্বেদের চরম সীমার দিকেই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষলক্ষণ সমূহের শীর্ষ-স্থানীয় যে বালকভাব, জড়ভাব ও পিশাচভাব বা চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান, ইহাও তাঁহাতে অষ্টাবিংশ বৎসর বয়সের মধ্যেই সুপ্রকট হইয়া উঠিল।

মহামৌনাবলম্বনের পূর্ব্বলক্ষণ

ঘৃণা-লজ্জাদি পাশ বন্ধনও ক্রমশ তাঁহার ঘুচিয়া গেল। পার্থিব জগৎ ও জগজ্জীবের সঙ্গে মেলা-মেশারূপ সম্বন্ধ সূত্রও ক্রমে ক্রমে তাঁহার ছিন্ন হইতে লাগিল। সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া স্বকীয় লীলার পরিপুষ্টি কল্পে যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সে সমস্তই প্রায় তাঁহার সম্পন্ন হইয়া আসিল। মহামৌনাব-লম্বনের জন্যই তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পুঞ্জীকৃত অধ্যাত্ম শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ তাঁহার মধ্যে শিশুভাবের

এমনই বিকাশ ঘটিল যে, তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াও লীলারহস্যের অনেক নিগূঢ় সন্ধান পাওয়া যাইত।

জগতের বন্ধু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে তখন জাগতিক বিষয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংশ্রব শূন্য মনে হইলেও জীবের কল্যাণ চিন্তাই তাহাকে সতত নিবিষ্টমনা করিয়া রাখিত। তাহারই কৃপা শক্তির পরশ পাইয়া বা তাহারই সুদিব্য ভাবের অনুপ্রেরণা বলে একে একে দিকে দিকে বিভিন্ন মহাপ্রাণ মনীষিবৃন্দ দেশ, সমাজ, জাতি ও ধর্ম্মের সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার অলক্ষ্য প্রেরণা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া অনেক সময় তাঁহারা ভাষার ভিতর দিয়াও উহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। ঠাকুর দয়ানন্দ, অবধূত জ্ঞানানন্দ, পাগল হরনাথ, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি সকল মহাজনই পূর্ব্ব বঙ্গের এই প্রচ্ছন্ন দেবতার প্রগাঢ় আকর্ষণ অনুভব করিতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে মধ্যে মধ্যে এই কথাটি শোনা যাইত :—

অন্যান্য মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

"ওরে, এবার পূর্ব্ববঙ্গে"

প্রভুর জীবন রহস্য এতই দুর্জ্ঞেয় ছিল যে অদ্যাপিও উহা সাধারণ মানব মনের ধারণাশক্তির বহির্ভূত রহিয়াছে। তাঁহার কৃপার স্পর্শে ধন্য যাঁহারা, তাঁহারা তাহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও অপ্রাকৃত শক্তি সামর্থ্য দেখিয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য, সাধু-সন্ন্যাসী বা ভক্ত-বৈষ্ণব মাত্র মনে করিতে পারেন না। মহাপাপ প্রলয়ণের হস্ত হইতে জগৎ রক্ষাকল্পে প্রভু যে আদর্শের বীজ বপন করিয়াছেন, দিন দিন তাহাই মহামহীরুহ

আকারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সমষ্টি জগজ্জীব যে এই ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের লীলা-নাটুয়ার দিকে উন্মুখ হইয়াই প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের সন্ধান লাভ করিবে, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বদরপুর নিবাসী বাদল বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি প্রভুর ব্রাহ্মণকান্দা অবস্থান কালে কৃপা লাভ করেন। পরবর্ত্তীকালে ইনি শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর অন্যতম সেবকরূপে পরিণত হন। সস্ত্রীক ইনি অতি পবিত্রভাবে প্রাণারাম প্রভুর স্মৃতি জড়ান পর্ণকুটীরে বসবাস করিতেন। এই বাড়ীতেও প্রভুর জন্য স্বতন্ত্র একখানি গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে তিনি অবস্থান করিতেন। ইনি বাড়ীতে ফলমূলাদি যখন যে দ্রব্য হইত, তাহাই শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবার্থে দিয়া যাইতেন। ইহার বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী একটী তেঁতুল গাছতলায় প্রভু অনেক সময় নিশি-যোগে শয়ান অবস্থায় থাকিতেন। প্রভুর সংসর্গের ফলে উক্ত বৃক্ষের তেঁতুল অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। প্রভুর আদেশ অনুযায়ী বিশ্বাসজী নিত্য লক্ষ নাম জপ ও উচ্চ কীর্ত্তনাদি করিতেন। 'ইহা মহানিশাক্ষণ,' 'ঐ ঊষাকাল চলে যায়' ইত্যাদি বলিয়া প্রভু ইহাকে সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত রাখিতেন, আর বলিতেন, "আমার কাছে আছিস্, তাই জেগে থাক্‌তে পারিস্ নতুবা এই মহানিশাক্ষণে বড় বড় যোগী ও মহা-পুরুষেরাও তমঃ নিদ্রার অধীন হয়ে পড়েন।"

বাদল বিশ্বাসের কথা

একবার বিশ্বাস মহাশয়ের গ্রামস্থ পানের বরজের মধ্যে

একটি বিষধর সর্প প্রভুকে দংশন করে। অতঃপর প্রভু একটি পুকুরের জলে বহুক্ষণ স্নান করিয়াই সুস্থ হইয়াছেন, এইরূপ প্রকাশ করেন। ওঝা ডাকা বা অন্য কোন ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয় না। বিশ্বাসজী প্রভুর বাকচর থাকার কালেও মধ্যে মধ্যে দুধ, ফল ইত্যাদি সেবার দ্রব্য লইয়া যাইতেন। কিন্তু অন্নাদি নিতেন না দেখিয়া একদিন প্রভু তাঁহাকে লিখিয়া দিলেন, "অন্ন ভিন্ন অন্য সেবা মিথ্যা।" ইহার পর একদিন বিশ্বাসজী বাড়ী হইতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া প্রভুর নিকট লইয়া গেলে, তিনি মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "বাদল, মহাঅন্ন এনেছ।" অতঃপর তিনি উহার কিছু গ্রহণ করিলেন। বিশ্বাসজী স্মরণানন্দে বিভোর হইয়া অন্ধকার রাত্রে এবং জল-বৃষ্টি-কাদার মধ্যেও তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। প্রভুর একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় তিনি শাস্ত্র গ্রন্থাদির সুবৃহৎ গাট্রী মাথায় করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেন। প্রভুর প্রভুর ধীর মন্থর গতিই গজগতিকে ধিক্কার দিত। কেহই প্রভুর ধীরে হাটার সঙ্গে দৌড়িয়াও সমানতাল রক্ষা করিতে পারিতেন না। বিশ্বাসজী তেমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত না হইলেও প্রভুর কৃপায় শাস্ত্রদর্শনের সকল তত্ত্বই বুঝিতেন। প্রভু যখন ভক্তদের কাঁধে চড়িয়া গমনাগমন করিতেন তখন বহনকারী ভক্তদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ছিলেন।

প্রথম জীবনে তিনি একজন সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। বন্দুক লইয়া বন্যজন্তু শিকারে যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রতাপে স্থানীয় বিষয়াভিমানী ধনী ও চরিত্রহীন

ব্যক্তিবা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। দুর্ব্বল ও দরিদ্রের প্রতি তিনি অসীম দয়া প্রকাশ করিতেন। একদিন প্রভু শ্রীঅঙ্গনে কুণ্ডের তীরবর্ত্তী ঝাউতলায় বিশ্বাসজীকে তাঁহার হাত দেখিতে বলেন। তিনি 'জ্যোতিষ জানি না' বলিলেও প্রভু বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে থাকেন। বিশ্বাসজী তখন প্রভুর শ্রীহস্ত ধারণ মাত্র, তাঁহাতে নানাপ্রকার বিচিত্র রেখাঙ্কন দেখিয়া এক দিব্য শক্তির প্রেরণায় প্রভুর ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত লক্ষণাদির বর্ণনা আরম্ভ করেন। অতঃপর 'প্রভো! কবে আপনার মহাপ্রকাশ হবে?' বার বার এই প্রশ্ন করিতে থাকেন। প্রভু কিন্তু ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া নিতান্ত অস্থিরতা ও কাতরতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পর স্বতপ্রবৃত্ত ভাবে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি কেমন করে এই জগতে এসেছি, তাহা জানিস্? সাড়ে তিন মন চাঁদের সুধা ও গাভীর অশ্রু আশ্রয় ক'রে আমার আবির্ভাব। আরো শুন্‌বি?" এইরূপ বলিতে বলিতেই নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রভুর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বিশ্বাসজী, "না প্রভো, আর বল্‌তে হবে না। যে কথা বল্‌তে আপনার কষ্ট হয়, তা আর বলে কাজ নেই" এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করার পর প্রভু ক্ষান্ত হইলেন।

বিশ্বাস মহাশয় মধ্যে মধ্যে 'কৃষ্ণ হে প্রাণবল্লভ' এই কথাটি ডাক ছাড়িয়া বলিতেন। প্রভু একদিন উহা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলেন, "ছি! অমন ক'রে বল্‌তে নাই! হৃদয়ের জিনিস লুকায়ে রাখতে হয়।" 'বল্লভ' 'প্রাণ' নাথ'

প্রভৃতি আদবের নামগুলি মুখেব বাহিব না। কবিযা অন্তরে গোপন বাখ। তাঁহাব শিক্ষা ছিল কিন্তু হবিনাম মহামন্ত্র অন্তরে বাহিবে সর্ব্বভাবে স্মবণ, মনন ও উচ্চাবণ কবা তাঁহাব আদেশ ছিল। অনেক সময তিনি বলিতেন, "হবিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চাবণ কব্‌বে যেন সহস্র হস্ত দূব হতে শোনা যায।"

১৩০৯ সালেব আষাঢ় মাসেব মধ্যভাগে কলিকাতায প্রভু প্রথম মৌনী হন এবং ক্রমে শ্রীঅঙ্গনে আসিযা কুটীবাবদ্ধ হইযা পড়েন। এ যাবৎ যাঁহাবা প্রভুব দর্শন-স্পর্শনে ও শ্রীমুখেব আদেশ উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থ বোধ কবিতেছিলেন, প্রভুব এই অদর্শন যন্ত্রণা তাঁহাদের প্রাণে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল। গৃহাবরুদ্ধ হইবাব পূর্ব্বে প্রভুব নিরুপম দেহশ্রী দেখিযা অনেকেই তাঁহাকে অপ্রাকৃত প্রেমময বিগ্রহ বলিযা ধাবণা কবিতেন। তিনিও মৌনাবস্থাব কিছুদিন পূর্ব্বে বলিযাছিলেন, "আমাব দেহে এখন বিষ্ণুলক্ষণ সকল প্রকাশ পাচ্ছে। আমি আব বাইবে থাক্‌তে পাবি না। আমাব তেজ এখন তোবা সহ্য কবতে পাব্‌বি না। ঘবে থেকে থেকে ব্যাধিব দ্বাবা বিষ্ণুলক্ষণ সকল লোপ কবায়ে আবাব তোদেব সঙ্গে মিশ্‌ব।" বাস্তবিকই তৎকালীন প্রভুব সেই দিব্য তেজপুঞ্জ কলেবরেব দিকে দৃষ্টিপাত কবা প্রাকৃত জীবেব পক্ষে ক্রমেই কষ্টকব হইযা দাঁড়াইল। অনেকে তখন প্রভুব সেই জ্যোতির্ময রূপ দর্শনমাত্র মূর্চ্ছিত হইযা পড়িতেন। ঘবে বন্ধ হইবাব পবেও কযেক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি কোন কোন ভক্তদেব উদ্দেশে কবিযা কাগজে অনেক কথা লিখিয়া জানাই-

মহামৌনাবলম্বন ও অস্পৃশ্যাস্পৃশ্য অবস্থা

তেন। কিন্তু ক্রমশ তাহাও বন্ধ করিয়া মহানীরবতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

১৩০৯ সালের আষাঢ় হইতে ১৩২৫ সালের মাঘ অর্থাৎ প্রায় সপ্তদশ বর্ষকাল প্রভুর মহাগম্ভীরা লীলা। এই সময়ের মধ্যে দেশ-বিদেশ হইতে যে কত পাপী, পতিত, সুধী, মনীষি, রাজা, জমিদার, সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহার অপার্থিব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং ক্ষণিকের দর্শন ও করুণার সাড়া পাইবার জন্য আকুলী-ব্যাকুলী করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদিও এই সময়ে তাঁহার দর্শন একান্তই দুর্ল্লভ ছিল, তবু প্রাণের আর্ত্তি-আকুলতা অনুসারে অনেকে যে নানাভাবে তাঁহার দর্শনাদিও লাভ করিতেন, ইহাও সত্য।

প্রভুর মৌনাবলম্বনের প্রথম কয়েক বৎসর শ্রীঅঙ্গন খুব নির্জ্জন থাকিত। শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা হইবার পর কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী এবং বিলাসীযুবক হর রায় দীন নিষ্কিঞ্চন ভাবে কিছুদিন সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ইহাকে প্রভু বাকচরে থাকিবার সময় কৃপা করেন এবং নানা কঠোরতার মধ্যে রাখিয়া ভক্তি-ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান করিয়া তুলেন। তাঁহার পর ছোট জয়নিতাই নামে আর একজন ভক্ত শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবা পরিচর্য্যা আরম্ভ করেন। অতঃপর তারকেশ্বর বণিক (বি, এ) নামক একজন কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত শ্রীঅঙ্গনের সেবার ভার গ্রহণ করেন। ইনি মধ্যে মধ্যে প্রভুর শক্তিমত্তা পরীক্ষার জন্য নানা কৌশল

সেবাইতগণের পরিচয়

অবলম্বন করিতেন। উহাতে একদিন প্রভু তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, "তুমি পরীক্ষা করিও না। কারণ পরীক্ষায় আত্মা পচিয়া যায়। আত্মা পচাই শবত্ব। আপন প্রভুকে পরীক্ষা করিতে নাই।"

তারকেশ্বরের পরে বান্ধববর কৃষ্ণদাস প্রভুর সেবাইত নিযুক্ত হইয়া ১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

সেবাইত কৃষ্ণদাসের কথা

একদিন কলিকাতার রাজপথে অপরূপ প্রভুর রূপখানি দেখিয়াই ইনি পাগলপারা হইয়া যান। তৎপর হইতে মাঝে মাঝে রামবাগানে প্রভুর নিকট যাতায়াত করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভাবে ও প্রেমধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া উঠেন। প্রভুর আদেশে ইনি করতাল যোগে হরিনাম গাহিয়া কলিকাতার রাজপথে টহল দিয়া বেড়াইতেন। একদিন যখন তিনি কীর্ত্তনের মধ্যে দুইবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন প্রভু তাঁহার মস্তকোপরি উপর তালা হইতে একটি আশীষ পুষ্প বর্ষণ করেন। উহার পর গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় লোক লোচনের অন্তরালে অবস্থিতি করিতে থাকেন। কতিপয় জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি ইঁহাকে অশিক্ষিত বলিয়া উপহাস করিতেন। উহাতে একদিন প্রভু একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন, 'কৃষ্ণদাস বাবু এম, এ।' ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিতেন, "পূর্ব্বজন্মে ও রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র ও তৎপূর্ব্বজন্মে মারহাট্টী ব্রাহ্মণ ছিল।" মধ্যে মধ্যে প্রভু ইঁহাকে লিখিত ভাবে উপদেশ দিতেন। উহার কয়েকটি

উল্লিখিত হইল। যথা—"ধর্ম্ম করত কর্ম্ম খর, প্রখর যম রাজা। পৃথিবী রাধানাম বিহীন। রাইসেবা পুষ্পসেবা। রাধানাম জপ করিবা। প্রাণকে গড়ের মাঠ করিবা। বহুভোজন নিষেধ। ভিক্ষা সিদ্ধি। তুলসী, হরি, গরু পর নহে।"

মহামৌনাবলম্বনের পূর্ব্বে প্রভু বাদল বিশ্বাসজীর বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঐস্থান হইতে কলিকাতার ঠিকানায় কৃষ্ণদাসজীকে শ্রীঅঙ্গনে থাকিয়া সেবা করিবার জন্য শ্রীহস্তে একখানি পত্র দেন। ঐ পত্র পাইয়াই তিনি বদরপুরে প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসেন। প্রভু পুনরায় তাঁহাকে লিখিয়া জানান, "ত্রিকালে সর্ব্বোত্তমরূপে সেবা চালাইবা। আমার নিকট কিছু পাইবা না।" কৃষ্ণদাসজীর সেবার প্রথম কয়েক বৎসর অর্থাৎ ১৩১৪ সাল পর্য্যন্তও প্রভু অনেক সময় প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখিতেন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির কথা লিখিয়া জানাইতেন। প্রাণের আর্ত্তি-আবেগ অনুসারে কোন কোন ভক্তের উদ্দেশে নানা উপদেশাদিও লিখিয়া দিতেন। অতঃপর লেখা বন্ধ করিলেও ;—

"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"

এই মহাজন বাক্য অনুযায়ী অলক্ষিতে সহস্র সহস্র নরনারীকে স্বীয় প্রেমের কোলে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। শ্রীঅঙ্গন ক্ষেত্র ক্রমেই অগণিত ভক্ত সমাগমে তুমুল কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণদাসজীর পর প্রভুর অন্যতম সহচর ঠাকুর অতুল চম্পটী সস্ত্রীক শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গৌরাঙ্গ দাসজী নামক আর একজন ভক্তও চম্পটী মহাশয়ের আনুগত্যে সেবার আনুকূল্য বিধান করিতেন। এই সময়ে ১৩১৮ সালে বৃন্দাবন হইতে মহেন্দ্রজী স্বপ্নে প্রভুর দর্শন পাইয়া শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসেন। তিনি যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত ফুলবাদিনা গ্রামে ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র দেব সরকার। মায়ের নাম মনোমোহিনী দেবী। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর-শান্তস্বভাব ও ভক্তিধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ইঁহার অগ্রজ শশীভূষণ উদার, অমায়িক ও পরহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। কুসুন্দের ফকির নামক একজন সিদ্ধ মহাজন বালক মহেন্দ্রকে কোলে বুকে করিয়া আদর করিতেন। গ্রামে হরিসভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে প্রায়শ তিনি যাইতেন এবং গদাধরের পাদ-পদ্মের সান্নিধ্যে বসিয়া জপ-ধ্যান করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। অন্ধকার রাত্রে একাকী মাঠের মধ্যে গিয়া কৃষ্ণভক্তি কামনায় তিনি দেবী ভগবতীকে ডাকিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ঐ সময় একদিন শিব-দুর্গা জ্যোতির্ম্ময় রূপে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন ও প্রীতিভরে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। ঐ সময় মধ্যে মধ্যে তিনি 'হরি ওঁ' 'হরি ওঁ' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন।

মহেন্দ্রজীর কথা।

মহেন্দ্রজীর অগ্রজ শশীভূষণের সহিত একবার গয়াধামে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মুলঠী নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ দত্তের

আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মহেন্দ্রজীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে তিনি একবার দেখিতে চান। অতঃপর শশীভূষণ ছোট ভাইটিকে লালন-পালনের জন্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। অন্নদাবাবু নায়েবী করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা সারদাবাবু ডায়মণ্ডহারবারের প্রসিদ্ধ মোক্তার ছিলেন। সুশিক্ষার জন্য মহেন্দ্রজীকে সারদাবাবুর বাসায় রাখা হয়। আব্‌দুল করিম নামক একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে এইস্থানে মহেন্দ্রজীর বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে। হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "তোমাদের গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও আমাদের গোঁড়া মোল্লা-মৌলভীগুলিই বিবোধ ঘটায়। এরা না মর্‌লে আর মিলন হচ্চে না।"

সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য উমেশ দত্তের সহিত সারদাবাবুর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি ঐ বাসায় আসিতেন। মহেন্দ্রজীকে তিনি অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িবার সময় মহেন্দ্রজী অগ্রজের নিকট একখানি পত্রে কিরূপে কৃষ্ণ কমলের মধুপান করা যায়, তাহা জানিতে চাহেন। উহার উত্তরে প্রেমিক প্রাণ শশীভূষণ নানাধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া তাঁহার হৃদয়ের সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন। মহেন্দ্রজী ঐ সময় 'পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা,' অশ্বিনীদত্তের 'ভক্তি-যোগ,' প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর 'জীবন সংগ্রাম' প্রভৃতি পুস্তক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। নির্জ্জনে উদাসপ্রাণে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়াও হা-হুতাশ করিতেন।

অষ্টম শ্রেণীতে উঠিয়া মহেন্দ্রজী একবার দাদা শশীভূষণের সঙ্গে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন ও কয়েকমাস স্বতন্ত্রভাবে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়া একদিন সকলের অগোচরে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বনে বনে শ্যামসুন্দরের সন্ধান করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর মাত্র। বৃন্দাবনে বংশীবটে একদিন একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কালোয়াত সচ্চিদানন্দ স্বামী মহারাজ। স্বামীজি তখন 'গৌরাঙ্গ দরিদ্রালয়' নাম দিয়া একটি সেবাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। ঐ কার্য্যেব জন্য তিনি পাতিয়ালা, আলোয়ার প্রভৃতি রাজষ্টেট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রজী তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে পরিণত হইলেন।

দুইবৎসরাধিক কাল এই সেবাকার্য্যে মহেন্দ্রজী জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে তিনি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাজনদের পূতঃ সঙ্গলাভেও ধন্য হইতেন। বৈষ্ণবউত্তম জগদীশ বাবা, রাধিকা গোস্বামী, রাজর্ষি বনমালী রায়, হরিচরণ দাসজী, মনোহর দাসজী, রামকৃষ্ণ দাসজী, ভগবান দাসজী, নিত্যানন্দ দাসজী, গোপালদাস মোহন্ত প্রভৃতি সকলেরই তিনি স্নেহের পাত্র ছিলেন। সেবাকার্য্যের বিব্রত ভাবের মধ্যেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি-সুখে ভরপুর রহিতেন।

একদিন রাত্রে স্বপ্না বেশে যখন তিনি 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলিয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন,— সুন্দর প্রশস্ত একটি রাজপথ চলিয়া গিয়াছে আর তিনি ঐ রাস্তা

দিয়া অগ্রসর হইবার সময় দেখিলেন, উহার পার্শ্বে এক সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ পদ্মাসনস্থ হইয়া বসিয়া আছেন।

মহেন্দ্রজী ঐ অপরূপ রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-পুলকে অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত প্রভু জগদ্বন্ধুর নাম তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন পরে তাঁহার সহিত প্রভুর অন্যতম প্রাচীন ভক্ত নবদ্বীপ দাসজীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত ভারতীয় সাধু-মহাপুরুষদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভুর কথা, তাঁহার অদ্ভুত মৌনাবলম্বন ও শ্রীঅঙ্গনে অসূর্য্যম্পশ্য ভাবে অবস্থানের কথা শুনিলেন। প্রভুর কথা তাঁহার নিকট বড়ই মধুর লাগিতে লাগিল। প্রভুর রচিত কয়েকটী গানও তিনি লিখিয়া লইলেন। সেদিনকার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যে এই জগদ্বন্ধু সুন্দর, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। ইতিমধ্যে আর একদিন দিব্য ভাবযোগে প্রভুর দর্শন পাইয়া নিম্ন মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যথা :—

"সোহাগ আদর রসের নাগর জগত সুন্দর বরম্।
ব্রজ-গৌর লীলা মহীরুহ বীজ মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

ইহার পর হইতে প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনের আকুলতা তাঁহার বাড়িতে লাগিল। এদিকে চম্পটী মহাশয়ও এই সময়ে বৃন্দাবনে আসিলেন। একদিন তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে মহেন্দ্রজীকে দেখিয়াই ইনি যে প্রভুর বিশেষ চিহ্নিত জন, তাহা অনুভব করিলেন। আর একদিন পূর্ব্বাহ্ন সময়ে মহেন্দ্রজী যখন গোপীনাথ বাজারের রাস্তা দিয়া আপন মনে যাইতেছেন, তখন

চম্পটী ঠাকুর সহসা পিছন হইতে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"বল হরি হরিবোল ভাঙ্গ ভবের হাট।
রাজার উপর হও গে রাজা লাট সাহেবের লাট॥"

এইরূপ বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্রজীও কয়েকদিনের মধ্যেই 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলিয়া পাগলের ন্যায় শ্রীঅঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে তিনি প্রথম আঙ্গিনায় আসেন। প্রভুর মৌনাবস্থার তখন নবম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীঅঙ্গনের চতুর্দ্দিক তখন নানা প্রকার বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। দিবসেও বন্য শূকরাদির গতাগতি দেখা যায়। শ্রীঅঙ্গনের মধ্যেও তখন অপূর্ব্ব নীরবতা বিরাজ করিত। প্রভুর অলোক-সামান্য প্রভাবে কেহ জোরে কথাটি পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিত না।

চম্পটী-সহধর্ম্মিণী ক্ষীরোদা দেবী তখন ভোগ রন্ধন পূর্ব্বক ভোগের পাত্র হস্তে করজোড়ে মন্দির দরজায় দাঁড়াইয়া নিবেদন জানাইতেন। পার্থিব সম্পর্কে ইনি প্রভুর জেঠাতুতো ভাগিনেয়ী। তাঁহার স্বামী চম্পটী মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে একদিন তিনি শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রামবাগানে প্রভুর নিকট গিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন, "হে ছোট মামা! আমার কি কেউ নাই? আমায় কি কেউ আর ফরিদপুরে নিয়ে যাবে না?" প্রভু সেদিন মধুর স্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আছি। আমিই নিয়ে যাব।"

প্রভুর এই শ্রীমুখ বাক্য সার্থক হইয়াছিল,—শ্রীঅঙ্গনে তাঁহার সেবার ভাগ্য লাভে। রাত্রে তিনি নিকটবর্ত্তী তারিণী চক্রবর্ত্তীর বাসায় থাকিতেন।

তিনি ভোগ নিবেদন করা মাত্র প্রভু কোনদিন খিল খুলিতেন; কোনদিন বা কোন সাড়া-শব্দ দিতেন না। অন্নাদি জুড়াইয়া গেলে পুনরায় রান্না করার নিয়ম ছিল। প্রভু যেদিন ভোগ গ্রহণ করিতেন, সেদিন খটাস্ করিয়া খিল খুলিয়া মশারির পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রভুকে দর্শন করিবার বা তাঁহার দিকে কাহারও তাকাইবার সাহস হইত না। মন্দিরের ভিতর একটি ট্রাঙ্কে প্রভুর মুখ মুছিবার তোয়ালে থাকিত। ঐ ট্রাঙ্ক খুলিবার শব্দ হইলেই বুঝা যাইত, ভোগ শেষ হইয়াছে। অতঃপর অতি সন্তর্পণে ভোগের বাসনাদি বাহির করিয়া আনা হইত।

মহেন্দ্রজী শ্রীঅঙ্গনে আসিবার পব হইতে টেপাখোলাবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল সরকার মহাশয় নিত্য নিয়মিতভাবে সন্ধ্যাবেলা শ্রীঅঙ্গনে আসিতেন ও প্রভু-রচিত আরতি কীর্ত্তনাদি করিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ভোগের বাসন মাজা, ঝাট্ দেওয়া প্রভৃতি সেবার কার্য্যেরও সহায়তা করিতেন। মহেন্দ্রজীও সাধ্যানুসারে সেবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। নিত্য শেষরাত্রে তিনি প্রভুর সেবা-পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিয়া আনিতেন। ভোগের সঙ্গেই প্রভুকে পুষ্প-চন্দনাদি দেওয়া হইত। চন্দনের সঙ্গে দুই চারিটি তুলসীপত্রও দিবার

নিয়ম ছিল। প্রভু কোন কোন দিন রবারের পাদুকা পায় দিয়া ঐ পুষ্প-পাত্রে ছাপ দিয়া দিতেন।

মহেন্দ্রজী মধ্যে মধ্যে প্রভুর দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা-নিবেদন করিতেন। শ্রীঅঙ্গন প্রাঙ্গণ তিনি সর্ব্বদা ঝাট্ দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। প্রভুর দর্শন না পাইয়া একদিন তিনি মনের খেদে আত্মহত্যার সংকল্প করেন। পরে সহসা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি পাইয়া উহা খুলিতেই সনাতন গোস্বামীর আত্মহত্যা প্রয়াস ও মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহার নিরাকরণ অধ্যায় দেখিতে পান। তখন আত্মহত্যা অকর্ত্তব্য বোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিলেও 'প্রভুর দর্শনলাভ ব্যতীত বাঁচিয়া কি লাভ' এই ভাব তাঁহার অক্ষুণ্ণ রহিল। তৎপর গৌরাঙ্গ দাসজীর একখানি নোটখাতা খুলিতেই প্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত—'প্রভু পিপিলিকার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে পারেন'—এই বাক্যটি দেখার পর হইতে তাঁহার আত্মহননেচ্ছা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। প্রভু তখন মৌনী থাকিলেও ভক্তের ব্যাকুল প্রাণে মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা দিতেন। কেহ তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইলে তিনি কখনও গাভীর হাম্‌লানের মত একপ্রকার শব্দ করিতেন। কখনও কাশির শব্দ বা গলার খেওরের দ্বারা সাড়া দিতেন। কখনও শ্রীমন্দিরের মধ্যে রবারের পাদুকা পায়ে অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতেন। উহাতে ভক্তের বিষাদ-দৈন্য দূর হইয়া প্রাণে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইত। মহেন্দ্রজীর ব্যাকুলতাতেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ সাড়া দিতেন

ইতিমধ্যে একদিন মহেন্দ্রজী যখন শ্রীমন্দিরের বারান্দার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন প্রভু মন্দিরের মধ্যে একটি মোমবাতী ধরাইলে বেড়ার ছিদ্র-পথে প্রভুর নাভিদেশ হইতে নিম্ন অঙ্গের কিয়দংশ দেখিতে পান। সেই সুদিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, সুগভীর নাভি ও দিগম্বর বেশ দেখিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া যান।

শ্রীমন্দির সংলগ্ন ছাপরায় প্রভুর স্নানের উদ্দেশ্যে দুই তিন কলসী জল রাখা হইত। উক্ত ছাপরায় টিনের বেড়া আঁটা ছিল। প্রভু ইচ্ছামত আসিয়া ছাপরার কোণে রক্ষিত পাত্রে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন এবং শ্রীঅঙ্গে জল ঢালিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেন। দর্শনের কোন উপায় ছিল না। প্রভু যখন শ্রীঅঙ্গে জল ঢালিতেন, তখন ঐ জল চালিতাতলার দিকস্থ বেড়ার নিম্নপথে কল্ কল্ শব্দে গড়াইয়া পড়িত। উহা শ্রবণে ভক্তগণের প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইত। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের দিব্যগন্ধে মধ্যে মধ্যে শ্রীঅঙ্গন তখন ভরপুর হইয়া উঠিত। প্রভুর শ্রীঅঙ্গবিধৌত জল বাহিরে পড়িবার সময় মহেন্দ্রজী ও আর আর ভক্তগণ উহার কতক পান করিতেন ও কতক গায়ে মাখিতেন। কখনও বা ঐ জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। এইরূপে কিছুদিন যাইবার পর পুনরায় মহেন্দ্রজীর প্রাণে প্রভুর দর্শন-লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। এই সময়ে শ্রীঅঙ্গনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিত। একদিন একটি সুশ্রীমান বালক হঠাৎ শ্রীঅঙ্গন অভিমুখে আসিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে

লাগিল, 'এ ঠাকুরটির কাছে থাক্‌তে গেলে নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসনা চাই।' মহেন্দ্রজী বালকটিকে নিকটে ডাকিয়া আদর করিতে লাগিলেন কিন্তু সে বলিতে লাগিল, "আমায় বেঁধো না। অমায় বেঁধো না। আমার অনেক কাজ। এ ঠাকুরটির কাছে থাক্‌তে গেলে নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসনা চাই।" এইরূপ বলিতে বলিতে বালকটি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্রজী ব্যাকুলভাবে প্রভুর একজোড়া পাদুকা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকিলে একদিন প্রভু ফুলের সাজির ভিতর একজোড়া পাদুকা দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বাঞ্ছা-কল্পতরুর এ দান পাইয়া পরম আনন্দের উদয় হইয়াছিল। শ্রীঅঙ্গের কিয়দংশ ব্যতীত প্রভুর সম্পূর্ণ দর্শন না পাইলেও প্রভুর স্পর্শ করা ভোগের বাসন, কলসী প্রভৃতি মাজিবার সময় সাক্ষাৎ স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেন। একদিন তিনি কতকগুলি সুগন্ধি ফুলের সঙ্গে কয়েকটি গন্ধহীন ফুল দিয়া 'দেখি, প্রভু গ্রহণ করেন কিনা' এইরূপ ভাবিতে থাকেন। ঐ দিন দেখা গেল প্রভু দুই প্রকারের ফুলই গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে তিনি ভক্তস্বভাবসুলভ দৈন্যভাবে ভাবিতে লাগিলেন, "গন্ধহীন হলেও আমি বাদ যাব না। প্রভুর ঐ রাঙ্গাচরণে স্থান পাব।"

মহেন্দ্রজী মধ্যে মধ্যে দিগম্বরী দেবীর নিকট গিয়া তাঁহার মুখে প্রভুর বাল্য লীলাকথা শুনিতেন। দিগম্বরী দেবী প্রভুর কথা বলিতে বলিতে 'জগতকে আগে চিন্‌তে পারি নাই' বলিয়া কত আক্ষেপ করিতেন। ক্ষীরোদা দেবীও বলিতেন, "ছোট মামা,

ছোটমামা ব'লে কত ডেকেছি, আব্দার করেছি কিন্তু তিনি যে স্বয়ং প্রভু তা বুঝ্তে পারি নাই, ধর্তে পারি নাই।" প্রভুর কৃপায় ক্ষীরোদা দেবী শেষজীবনে ব্রহ্মচারিণীর বেশে সুবিমল শান্তির ছায়াতলে বাস করিলেও সময় সময় পরলোকগতা কন্যা সরযূর জন্য তাঁহার প্রাণটি কাঁদিয়া উঠিত। মৌনাবস্থার পূর্ব্বে একদিন প্রভু তাঁহাকে সরযূর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে, সরযূর জন্য দুঃখ করিস্ না। আমি যখন অযোধ্যায় সরযূ নদীতে স্নান কর্তে গেলাম, তখন দেখি যে, সে আমার সাম্নে এসে হাত দুখানি বাড়ায়ে আমার কোলে উঠ্বার জন্য চেষ্টা কর্তে লাগ্ল! সে সাধারণ মেয়ে নয়।"

শ্রীঅঙ্গনেই বাদল বিশ্বাসজীর সঙ্গে মহেন্দ্রজীর আলাপ হয়। বিশ্বাস মহাশয়ের বীর-পুরুষের ন্যায় চেহারা ও গম্ভীরভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। এই সময় বিশ্বাসজী মধ্যে মধ্যে শ্রীঅঙ্গনে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে তিনিই শ্রীঅঙ্গনের অন্যতম সেবকরূপে পরিণত হন। মহেন্দ্রজীকে তিনি সদানন্দ বলিয়া ডাকিতেন এবং কাছে কাছে রাখিয়া সেবার ভাগ্য দিতেন।

প্রভুর নীরবতার মাধুরী

প্রভুর নীরবতার ভিতর দিয়া সমগ্র জগতের এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে। কোন মেশিনের যেমন একস্থানে একটি টিপ দিলেই সমগ্র মেশিনটি সক্রিয় হইয়া উঠে, প্রভুও তেমনি শ্রীঅঙ্গনের ঐ কুটীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া স্বকীয় অমৃত ইচ্ছাশক্তির সঞ্চারে দিকে দিকে নানা মনীষি-মহাপ্রাণকে দেশ, জাতি ও জগতের কল্যাণকার্য্যে নিয়োজিত

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি সকলের কেন্দ্র।" আদর্শ মানবতা ও পবিত্রতার তিনি জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। প্রাকৃত জগতের মধ্যে এই অপ্রাকৃত রূপ-লাবণ্যময় প্রাণ-পুরুষটির অবস্থান চাতুর্য্যও অতি অভিনব। জাগতিক বিষয়-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারতা জিনিসটি কি, প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনই তাহাব প্রকৃত সাক্ষ্যস্বরূপ।

কে তাঁহাকে ভগবান বলিতেছে, কে অবতার বলিতেছে, সেদিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। তিনি আছেন, স্ববোধিসত্ত্বায় সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীঅঙ্গন কেন্দ্রে সেদিন আমরা ভক্তিবিনম্র শিরে না দেখিয়াছি এমন দেশহিতৈষী ও জগৎকল্যাণব্রতী মহাত্মা সত্যই সুদুর্ল্লভ। যে কোন প্রকারে প্রভুর কৃপার পবশ না পাইয়াছেন এমন দেশবরেণ্য ও সমাজশ্রদ্ধেয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি আমরা সত্যিকাব অনুসন্ধিৎসা লইয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, শ্রীঅঙ্গনের এই প্রচ্ছন্ন দেবতার সঙ্গে জাতিব সর্ব্ববিধ প্রাণশক্তিরই অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রহিয়াছে। বাহ্যত প্রভুর কথা প্রকাশ করেন না অথচ অন্তবে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, জাতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতিমূর্ত্তি এমন মনীষি সজ্জনের অভাব নাই। অথচ আজ পর্য্যন্ত এই প্রেমাবতাব জগদ্বন্ধু সুন্দরের প্রতি দেশ ও জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণেব কৃতজ্ঞতার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছে না; ইহা কি জাতিব পক্ষে কলঙ্কেব কথা নয়?

প্রভু জগদ্বন্ধু যে অজাতশত্রু। আব সব কিছু বাদ দিয়া আদর্শ মানবতা বিকাশের অনুকূল অনেক কিছুই যে তাঁহার

দিব্যজীবনে সম্যক্ আচরিত ও প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি তাঁহার কথা গাথা লইয়া অদ্যাপিও সুধীসজ্জন সমাজ কোন আলোচনা করিতেছেন না কেন? প্রভু কি এম্‌নি ভাবেই চিরকাল উপেক্ষিত থাকিবেন? বাঙ্গালী জাতিব প্রাণসত্তা যাহা, তাহা যে এযুগে প্রভুব প্রচাবিত প্রেমধর্ম্মেব মধ্যেই সুনিহিত আছে। হরিনাম সংকীর্ত্তনের কথা শুনিলে আজ পর্য্যন্ত তথাকথিত শিক্ষিতগণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উহা যে বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষারই বিষময় ফল। আজকাল মুখে অনেকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা বলেন কিন্তু কার্য্যত নানাপ্রকার জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধু যে হরিনামের ধ্বজা সগৌববে উত্তোলিত করিয়াছেন, একমাত্র ইহার মধ্যেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূল বীজ নিহিত আছে। হরিনামের সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন, "হরিনাম শব্দ হরি ঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবৎ বা পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র সূর্য্যকে বুঝায়, তেম্‌নি গুরু, গৌরাঙ্গ, গোপী, রাধা, শ্যাম—সব মিলিয়া এক হরিনাম হয়। হরিবোল বল্‌লেই সব বলা হয়।" সাধারণতও আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বদেবতার প্রীত্যর্থেই হরিবোল ধ্বনি করা হইয়া থাকে। সুতরাং আপনি শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যই হউন আর যে কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, হরিনাম আপনার ইষ্ট প্রীতির বিষয়, অতএব অবশ্য করণীয়। আর তথাকথিত উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলিয়া একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তন উপাসনার দ্বারাই আমরা সর্ব্বমানব পরস্পরকে ভাই

ভাই বলিয়া একটি অপূর্ব্ব সাম্যবাদের অধীন হইতে পারি। মুসলমানদের নমাজের স্থানে যেমন কে রাজা, কে প্রজা চিনিবার উপায় নাই, সকলেই সেখানে ভ্রাতৃভাবে গলাগলি করিয়া থাকেন, বিশেষত ধর্ম্ম উপাসনার ঐ ঐক্যের দ্বারা তাঁহাদের জাতীয় একতা সাধনও যেমন সহজসাধ্য হইয়াছে, আমরা হিন্দুগণও একমাত্র সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়াই স্বজাতির বাঞ্ছিত একতা লাভ করিতে পারি। সুতরাং জাতির ও সমাজের কর্ণধার স্থানীয় মনীষিগণকে সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি এবং স্বদেশ, স্বজাতি তথা বিশ্বজগতের প্রকৃত কল্যাণের জন্য নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে বিরাটভাবে সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাহাতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের মহামিলন হইতে পারে, সমস্ত জাতির বর্ত্তমান ঘোরতর সংকট মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে সে ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী হইতেও আবেদন জানাই।

বাঙ্গালীর স্বজাতীয় স্বভাবনিষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, এ জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, হরিনাম প্রেম ধর্ম্মনীতিব সুষ্ঠু আচরণ নিষ্ঠার উপর। প্রতীচ্য সভ্যতার মোহে উৎকট ভোগবাদের প্রাবল্য আমাদের জাতীয় জীবনের দিকে দিকে আজ প্রকট হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের সনাতন ত্যাগ বৈরাগ্যের ভিত্তিমূলে যদি আমাদের উন্নতির প্রাসাদ সুগঠিত না হয়, তবে যে ধ্বংস প্রলয়ের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া কিছুতেই আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। আজ পৃথিবীর দিকে দিকে ঘৃণিত স্বার্থপরতার যে চূড়ান্ত

নিদর্শন দেখা দিয়াছে, ইহার হস্ত হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে যে নিঃস্বার্থপরতা ও প্রকৃত অহিংসা প্রেমের শ্রাবণের ধারা বর্ষণের প্রয়োজন, তাহাই দেখাইয়াছেন প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য এই যে, আজ আবার সর্ব্বপ্রকার অশান্তি উপদ্রবের মধ্যেও তাঁহারা সত্যকার শান্তি ও মহামিলনের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভবিষ্যৎ মানবজাতির ভাগ্যবিধাতারূপেও আজ বাঙ্গালীর প্রাণ বিগ্রহ সুপ্রচ্ছন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন, ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের অন্ধকার কক্ষে।

প্রভুর জন্মোৎসব

১৩১৪ সালের বৈশাখী সীতানবমী তিথিতে শ্রীঅঙ্গনে প্রথম প্রভুর জন্মোৎসব আরম্ভ হয়। প্রথম বর্ষে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি হইয়াছিল। ক্রমশ এই উৎসব সাতদিন বা ছাপান্ন প্রহরব্যাপী ভুবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্ত্তন ও বিরাট মহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। প্রভুর এই জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী শ্রীঅঙ্গনে সমাগত হইয়া থাকে। উৎসবের সেবকগণের উদ্যম ও উৎসাহের তুলনা নাই। শ্রীঅঙ্গনে পুরীধামের বা জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় সর্ব্বজাতি এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রভুর বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হয়।

১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রভু অকস্মাৎ একাদি-ক্রমে দ্বাদশদিন ভোগগ্রহণ ও দরজা উন্মোচন বন্ধ করিয়াছিলেন। ঐ নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দেশ-বিদেশ

হইতে সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসেন।

দ্বাদশদিন অনাহার

দ্বাদশদিন পর ভক্তগণ অনন্যোপায় হইয়া শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকের বেড়া কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন এবং দেখেন যে প্রভু মহাভাববিহ্বলভাবে শয্যার উপর শায়িত আছেন। এই দীর্ঘদিনের অনশনেও তাঁহার সুদিব্য কান্তি-শ্রীর কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় নাই। সেদিন সমাগত জনগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তিপ্রদত্ত সেবার দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও সকলের উৎকণ্ঠা দূর করিয়াছিলেন।

বহিরঙ্গনে পদার্পণ

সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল পরে ১৩২০ সালের ২৬শে মাঘ, রবিবার, শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে প্রভু শ্রীমন্দির হইতে সহসা বাহির হইয়া চালিতা-বৃক্ষমূলে চার পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। উক্ত দিবস সেটেলমেণ্টের কয়েকজন কর্ম্মচারী শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রভুর তেজপুঞ্জ কলেবর দর্শনমাত্র ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। প্রভুর বহিরঙ্গনে পদার্পণের সংবাদ দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং দর্শন-পিপাসুচিত্তে দলে দলে নরনারী শ্রীঅঙ্গন অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে থাকে। এদিকে ভক্তগণও পূর্ণিমার দিন বিরাট উৎসবানন্দের ব্যবস্থা করেন। ইহার পর বৎসর হইতে প্রভুর বহিরঙ্গনে পদার্পণ স্মৃতি উপলক্ষে উক্ত মাঘী ত্রয়োদশী হইতে

পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবন্ধুবাসন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

প্রভু ঐ সময় হইতে প্রায় দুই বৎসরকাল পর্য্যন্ত দর্শনার্থী-দিগকে মধ্যে মধ্যে দর্শন দানে কৃতার্থ করিতেন। শ্রীঅঙ্গন-ক্ষেত্র তখন সর্ব্বদা আনন্দ-কলরোল ও তুমুল কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত থাকিত। প্রতিদিন অন্ততঃ দুই তিন হাজার নরনারীর সমাগম হইত। উহাতে হিন্দু-মুসলমানের কোন ভেদ ছিল না। অসংখ্য মুসলমানও প্রভুর দর্শনলাভের জন্য তৃষিতচিত্তে শ্রীঅঙ্গনে ছুটিয়া আসিতেন। একদিন দর্শনলোলুপ একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি, আপনারাও দেখ্‌তে এলেন ?" উক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ঐ কথার উত্তরস্বরূপ বলিয়াছিলেন, "বাধা কি ? এ তো কোন হিন্দুর দেব-মন্দিরে আসি নাই। ইঁহার নাম জগদ্বন্ধু। আমাদেরও বন্ধু বটেন। আমরা জগতের বন্ধুকে দেখ্‌তে এসেছি।"

দর্শন দানের কথা

প্রভু জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। একমাত্র ভক্তির বলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার দর্শন, স্পর্শন ও সেবা সৌভাগ্যের অধিকারী হইত। প্রভুর তৎকালীন অবয়বখানি সুদর্শন ও নয়নামোদী ছিল। তাঁহার ঐ সময়ের আকৃতি সপ্তদশ বৎসরের প্রতিমূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অধিকতর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, লাবণ্যভরপুর ও নবনীর ন্যায় সুকোমল ছিল। মস্তকে তাঁহার

সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম ও সর্ব্বাঙ্গ সুবলিত ছিল। মাধুর্য্যময় হরিণ নয়নের ঈষৎ বঙ্কিম কটাক্ষ সকলেবই মন-প্রাণ আকর্ষণ করিত। তাঁহাব হস্ত ও পদের তলদেশ, ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশদ্বয়ে অপূর্ব্ব রক্তিমাভা বিবাজ করিত। শ্রীমুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য-সুষমা ও অধরের আধ আধ হাসি সকলকেই মুগ্ধ করিত। তাঁহার ললাট, বক্ষদেশ সুপ্রশস্ত ও শুভ্রজ্যোতিঃবিশিষ্ট ছিল। তাঁহার সেই সময়ের সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ও শিশুর ন্যায় দিগম্বর বেশ দর্শনে তাঁহাকে এক মহাভাবময় বিগ্রহ বলিয়া ধারণা হইত। তাঁহাব শ্রীঅঙ্গ হইতে মধ্যে মধ্যে অপ্রাকৃত এক দিব্য গন্ধ বিকীর্ণ হইত। সুউজ্জ্বল গৌরকান্তিমাখা সেই অক্রোধ পবমানন্দ মূর্ত্তিখানি একবার দেখিলে নয়নদ্বয় আব ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা হইত না। তাঁহাব মধুময় স্পর্শ সুখেবও তুলনা ছিল না। নব-নারীকুল চিত্র পুত্তলিকাব ন্যায় ঐ প্রেমময় বর অঙ্গেব দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। কোন প্রকারে দর্শনে বাধা পাইলে সকলেব মুখেই 'আর একটু দেখে লই' এইরূপ আকুল আগ্রহ প্রকাশ পাইত। প্রভুকে শত-সহস্রবার দেখিলেও কাহাবও অতৃপ্ত বাসনাব পবিতৃপ্তি ঘটিত না।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবার ভার গ্রহণ কবিবাব পর রাজবাড়ীর বান্ধব বরেণ্য যোগেন্দ্র কবিরাজেব সঙ্গে মিলন ঘটে। ক্রমে মহেন্দ্রজীর প্রাণে দিকে দিকে প্রভুর আগমনী বার্ত্তা ঘোষণা করিবার সাধ জাগে এবং প্রভুর সম্মতি-সূচক প্রেরণা লইয়া তিনি একটি

অভিনব কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়ই কালক্রমে মহানাম সম্প্রদায় নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। উক্ত সম্প্রদায় ১৩২৩ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত বাংলার বিভিন্ন নগর-পল্লীতে এবং সুদূর পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত প্রেমময় প্রভুর মহাউদ্ধারণ লীলাবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায় নায়ক শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের শান্তিময় ক্রোড়ে যাবতীয় জীব-মানবকে স্থান দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। কিছুকাল তিনি শ্রীমৎ কুঞ্জদাসজীকে * স্বতন্ত্রভাবে প্রচারণের নেতৃপদে অভিসিক্ত করেন। একদল সরল বিশ্বাসী, ত্যাগ বৈরাগ্যব্রতী, সুশিক্ষিত, ব্রহ্মচারী, বালক ও যুবকই উক্ত সম্প্রদায়ের সেবকরূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রভুর পবিত্র মহানাম মহাকীর্ত্তন বা—

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম সম্প্রদায় ও প্রচারণ কাহিনী

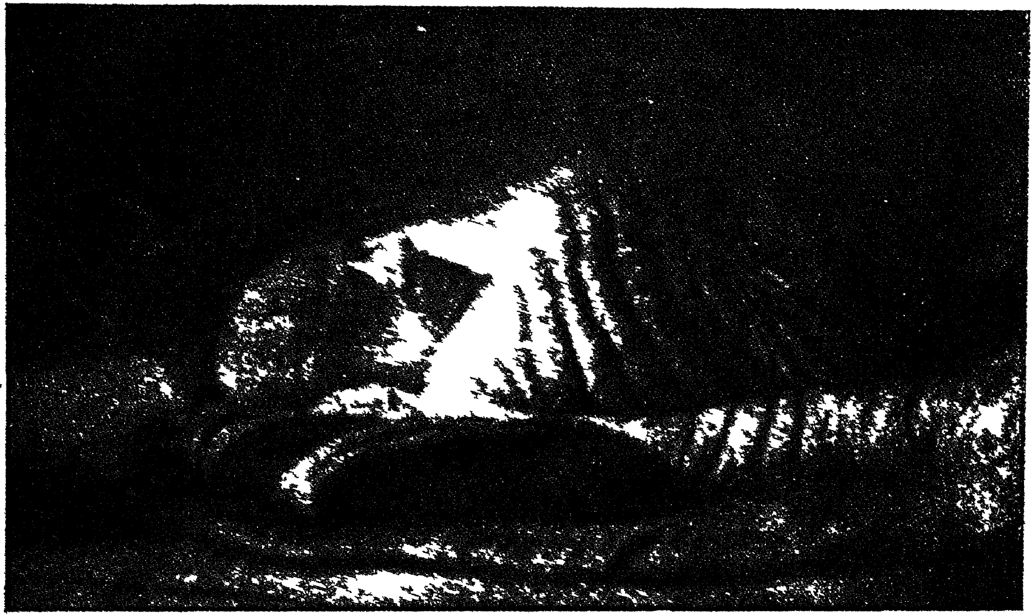
"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হাকীট পতন॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)"

এই মহাউদ্ধারণ মহামন্ত্রই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বসার

---

* এই কুঞ্জদাসজী পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম ডাহাপাড়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ কুঞ্জের সংস্কার সাধন করিয়া সেখানে প্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত কয়েকজন অনুগত বান্ধবসহ নিয়মিত পূজার্চ্চনা ও বাৎসরিক প্রভুর জন্মোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

আটচল্লিশ বৎসবেব প্রতিমূর্ত্তি



মহাভাবে বিভোব প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দব

অবলম্বন। উপরোক্ত হরি-মহানামের অমোঘ শক্তিতে এ যাবৎ সহস্র সহস্র নর-নারী প্রভুর পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরম শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন।

প্রায় সপ্তদশ বৎসর কুটীরাবদ্ধ ও মহামৌনাবলম্বী থাকিবার পর ১৩২৫ সালের ২৮শে মাঘ সর্ব্বপ্রথম প্রভু নগরে বাহির হন। আধ আধ স্বরে 'ফ ফ ফরিদপুর' এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া তিনি মৌন ভঙ্গ করেন। প্রভুর লীলাভূমি ফরিদপুব ক্রমশ ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

মৌনভঙ্গ ও ভ্রমণ কাহিনী

নানাদেশ হইতে নর-নারীসমূহ আকুলপ্রাণে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের পূতঃধূলির পরশ পাইবার জন্য ছুটিয়া আসে। প্রভু গৃহ হইতে বাহির হইবার পর প্রথম কেদার কাহার বাড়ীতে যান। অতঃপর যখন তিনি ভক্তগণের স্কন্ধে কীর্ত্তন পরিবেষ্টিত ভাবে সহরাভিমুখে চলিলেন, তখন 'প্রভু বাহির হইয়াছেন' শুনিয়া যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা হইতেই দর্শনের জন্য ছুটিল। বিদ্যালয়গুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক শূন্য হইয়া পড়িল। কোর্ট-কাছারীর কাজ-কর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেল। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটীসমূহ হইতে আমলা-কর্ম্মচারীবর্গ সকলেই প্রভুর দর্শনের আকাঙ্খায় উৎকণ্ঠিতভাবে যশোহর রোডের পার্শ্বদেশে আসিয়া জড় হইলেন। লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কেহ ছাদের উপর, কেহ গাছের ডালে, এইরূপে যে যেখানে যেভাবে দেখিতে পারিবে মনে করিল, সে সেই ভাবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তুমুল

"জয় জগদ্বন্ধু বোল, হরিবোল হরিবোল" এই কীৰ্ত্তনের রোলে গগন পবন ও দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। একদিন ব্রজমণ্ডলে গোপকুমারিগণ শ্যামের মোহন বাঁশরীনিক্কণ শুনিয়া যেমনভাবে গৃহধৰ্ম্ম, কুলধৰ্ম্ম সব উল্লঙ্ঘন করিয়া কুঞ্জকানন অভিসারে ছুটিয়া গিয়াছিল, সেদিনও নরনারীকুলের অবস্থা ঠিক সেইরূপে পরিণত হইয়াছিল।

প্রভু সেদিন উক্ত সংকীৰ্ত্তন আবেষ্টনীর মধ্যে টেপাখোলা পৰ্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে প্রায় প্রত্যহ তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ফরিদপুর সহরের বিভিন্ন রাস্তা ও যশোহর রোড দিয়া বরাবর বহুদূর পৰ্য্যন্ত গমন করিতেন। বাকচরস্থ ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে তথাকার শ্রীঅঙ্গনে গিয়াও কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সময়ে খোল করতাল ও কীৰ্ত্তন বাহিনী শোভমান থাকিত। ভ্রমণের ছলে তিনি দর্শনার্থী নরনারী কুলের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন।

১৩২৫ সালের মাঘ মাস হইতে ১৩২৮ সালের ভাদ্র মাস পৰ্য্যন্ত প্রায় তিন বৎসর কাল প্রভু কখনও দোলায়, কখনও কতিপয় ভক্ত প্রদত্ত গাড়ীতে, কখনও বা নৌকায় ভ্রমণ করিতেন। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর নৌকায় ভ্রমণের সময় নদীর দুইকুলে দলে দলে দর্শন লোলুপ নরনারী দাঁড়াইয়া হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিত। ঘাটে ঘাটে যখন নৌকা লাগান হইত, তখন ভক্তি-নিষ্ঠাবশে কেহ কেহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা

অঞ্জলি প্রদান করিত, কেহ কেহ বা নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী উপহার লইয়া আসিত। প্রভুও ঐ সমস্ত আনীত দ্রব্যের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া অপার ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিতেন।

গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পর প্রায় সময় প্রভু মহাভাবে বিভোর থাকিতেন। এই জগতে থাকিয়াও তিনি এই জগতে থাকিতেন না। কাহারও দিকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেন না। সময় সময় তাঁহার শ্রীমুখে অনেক রহস্যজনক বাক্য উচ্চারিত হইত। 'হংস আন' বলিলে কোন ভক্ত তাঁহার ভ্রমণের অভিপ্রায় ভাবিয়া গাড়ীখানি লইয়া আসিত। 'আকাশটা নামায়ে দাও' বলিলে কোন ভক্ত প্রভুর মশারিটা নামাইয়া দিতেন। অপ্রাকৃত শিশুভাবই তাঁহার এই সময়ের দেব চরিত্রেব বিভূষণ ছিল। ঐরূপ ভাববিহবল অবস্থাতেও যে তিনি দেশ ও সমাজের দুর্দ্দশাব কথা চিন্তা করিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় শ্রীমুখের কোন কোন বাণীর দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। ঐ সময়ে একদিন তিনি সহসা জলদগম্ভীর-স্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সমাজ রাখ্‌বো না, সমাজ রাখ্‌বো না, সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেব।"

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান শতধাবিচ্ছিন্ন ভাব বিদূরিত করিয়া এই মহান্ জাতিকে অখণ্ড একতার পাশে বাঁধিয়া দিবার বলবতী বাসনা কিরূপে তাঁহাব অন্তরে এই অন্তর্লীলাতেও বিদ্যমান ছিল, উপরোক্ত বাণীর দ্বারা তাহাই প্রতীয়মান হয়। অখিল মানব সমাজের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কারের বন্ধন, তাহার ভবিষ্যৎ মহামিলনের অন্তরায়, তাহা তিনি প্রেমধর্ম্মের অমিত

প্রভাবের দ্বারাই দূর করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। বিশ্বে আমরা সবাই যে ভাই ভাই এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বেব বন্ধন সুদৃঢ় না হইলে যে জগতের প্রকৃত কল্যাণ নাই, ইহাই তাঁহার প্রাণের কথা।

অন্য একদিন ফরিদপুর জুবিলি ট্রাঙ্কের পারে যখন একটি স্বদেশী সভার অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন ভক্তগণ তাঁহাকে গাড়ীতে করিয়া উক্ত সভাব নিকটবর্ত্তী বাস্তা দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। প্রভু ঐ সভা-স্থানেব নিকটস্থ হওয়া মাত্র নিতান্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে করিতে, "এবার আমি খাব, খাব—সব খাব" গগন ভেদীস্বরে এইরূপ বলিয়া সভাস্থ জনগণের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভারত-গৌরব অম্বিকাচবণ মজুমদার মহাশয় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য সকলে প্রভুর ভিতরে সেদিন অসাধারণ ঐশীতেজের বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

আমাদের মনে হয়, বিশ্ব জগতকে নূতন কবিয়া গড়িবাব যে সংকল্প তিনি পোষণ করিতেন, তাহা সত্যে পরিণত হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। জগতের সভ্যতাগর্ব্বী জাতি সমূহ আজ একদিকে যেমন জড় বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা পরস্পর অতীব ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, অন্যদিকে তেম্নি জঘন্য স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া ছিন্ন-ভিন্নও হইতে চলিয়াছে। একমাত্র প্রেমধর্ম্মের দ্বারাই যে তাহাদেব মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক যোগাযোগ

সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে—ইহাই প্রভু জগদ্বন্ধুর মরমের বার্ত্তা। হিংসা, অনাচার ও উৎপীড়নাদির চির অবসান ঘটিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি প্রভুর প্রেমাদর্শবাদের অনুকূলে আত্মনিয়ন্ত্রণের এমন এক অভিনব অধিকার পাইবে, যাহার ফলে জগৎ হইবে চির শান্তি নিলয়; ভূলোক হইবে প্রেমরঙ্গ ভূমি গোলোকে পরিণত।

ঐ শুনুন, দিক-বিদিকের ধ্বংসলীলার মধ্যেই নূতন সৃষ্টির বিজয় দুন্দুভি বাজিতেছে—স্বর্গীয় নন্দন পারিজাতের সৌরভে মানব জাতির প্রাণ-মন আমোদিত হইয়া উঠিতেছে। মানব-নিবহের মনদর্পণ হইতে দানব স্বভাবের কলঙ্ক কালিমা অপনোদিত হইলেই স্বচ্ছ সুনির্ম্মল দেবভাবে তাহারা চিরসমুন্নত থাকিতে পারিবে।

মহাদশাশ্রব গ্রহণ ও মহাপ্রকাশ

১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে প্রভু মহাদশাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবস্থাকে তিনি ব্রজলীলানায়িকা শ্রীমতি রাধার দশমদশা ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীমতীর দশম দশা হয়েছিল, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দ্বাদশ দশা হয়েছিল, এবার আমাতে ত্রয়োদশ দশা দেখ্‌তে পাবি। এবার আমাতে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য্য, বালকত্ব ও পূর্ণ তন্ময়ত্ব এই তিনটি লক্ষণ বেশী দেখ্‌তে পাবি।" তিনি তাঁহার এই মহামৃত্যুর অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন একটি লীলারূপে অভিহিত করিয়া ইহা হইতে তাঁহার মহাপ্রকাশের ইঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছেন। জীবকুলের পাপ-

তাপরাশি স্বকীয় শ্রীঅঙ্গে গ্রহণ করিয়াই তিনি বিশ্ব-জগতের মহাকল্যাণ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দান করিয়াছেন। যদ্যপি তাঁহার শ্রীদেহখানি আজ অস্থিময়, তথাপি উহাই জগতের জয়মঙ্গল ঘট এবং আমাদের স্বরাজমুকুট মণিস্বরূপ। পবম প্রেম ও পবিত্রতার অদ্বিতীয় আধার প্রভুব শ্রীদেহের যেরূপভাবে সেবাপূজা হইয়া আসিতেছে,তাহাও জগতে একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। তাঁহার ঐ চিদস্থিময় মহাবিগ্রহ ঘিরিয়া ঘিরিয়া আজ ঊনবিংশতিবর্ষাধিক কালযাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে হরি-মহানাম মহাকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ঐ মহাযজ্ঞেব হোতা বা পুরোহিত। এই মহাকীর্ত্তনের নিগূঢ় তথ্যরাজি প্রভু স্ববচিত ত্রিকাল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। 'হরিনামে দেহ হয়' 'হরিপুরুষ উদ্ধারণ. উচ্চারণ, উদ্ধাবণ আগমন' 'হবি শব্দ উচ্চারণ, হরি-পুরুষ উদয়,' 'হবিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু' প্রভৃতি লিখিয়া বান্ধববৈষ্ণব-বৃন্দের প্রাণে আশার কনকদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে প্রভুব মহাপ্রকাশে অপ্রাকৃত প্রেমমাধুর্য্যের প্লাবনে সমস্ত জীবজগৎ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান জগতের সমূহ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জগতে অবস্থিতি যে মানবজাতির অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিত্র অঙ্কন করিতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

দিকে দিকেই আজ প্রভুব নামের অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া যাইতেছে। প্রেমধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যে বর্ত্তমান হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরীভূত মানব সমাজের পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই, ইহা আজ অনেক সত্যদ্রষ্টা মনীষি

উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। বাঙ্গালীর জীবন বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মে জয়যুক্ত হইয়া অচিরেই বিশ্বজগৎকে এক পরম মঙ্গল-মুহূর্ত্তের সম্মুখীন করিয়া তুলিবে। দিগ্-দিগন্তের প্রলয়ঝঞ্ঝা দূরীভূত হইলেই জগতে প্রেম-মহামিলনরাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠার দিন আসিবে। প্রভু জগদ্বন্ধু অচিরাগত ঐ শুভদিনেই জগতের প্রত্যেক নরনারীর ঐহিক ও পারত্রিকের প্রকৃত বন্ধুরূপে পরিগণিত হইবেন। জয় জগদ্বন্ধু সুন্দর। জয় মহানাম যজ্ঞ।

সমাপ্ত

পারশিষ্ট

পুস্তকস্থ প্রধান প্রধান ঘটনার সময় নিরুপক তালিকা

সাল—মাস	ঘটনা
১২৬৯ (ভাদ্র) ……	শ্রীযুত দীননাথ ন্যায়রত্নের গুরুচরণ নামক পুত্রলাভ।
ঐ (চৈত্র) … ..	গুরুচরণের দেহত্যাগ
১২৭২ (চৈত্র) ……	শ্রীযুত দীননাথ ন্যায়রত্নের কৈলাসকামিনী নামক কন্যালাভ
১২৭৫ (শ্রাবণ) ……	শ্রীযুত দীননাথের কন্যা ও সহধর্ম্মিণীসহ ডাহাপাড়া গমন
১২৭৮ (১৭ই বৈশাখ, শনিবার)	প্রভুর শুভ আবির্ভাব
১২৭৯ (আষাঢ়) … ..	বামাদেবীর দেহত্যাগ ও প্রভুর গোবিন্দপুর আগমন
১২৭৯ (ফাল্গুণ) … ..	কৈলাস কামিনীর দেহত্যাগ
১২৮২ (বৈশাখ) ……	প্রভুর বিদ্যারম্ভ
১২৮৫ (বৈশাখ) ……	দীননাথের দেহত্যাগ
১২৮৫ (মাঘ) ……	প্রভুর ব্রাহ্মণকান্দা আগমন
১২৮৬ (আশ্বিন) ……	দীননাথ অগ্রজ ভৈরবের দেহত্যাগ
১২৯১ (বৈশাখ) ……	প্রভুর উপনয়ন
১২৯২ (অগ্রহায়ণ) … ..	প্রভুর অষ্টম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ফরিদপুর জিলাস্কুল ত্যাগ

১২৯২ (মাঘ) ...... রাচী গমন ও পাঠ আরম্ভ

১২৯৩ (কার্ত্তিক) ..... পাবনা গমন ও পাঠ আরম্ভ

১২৯৫ (আশ্বিন) ... .. পদ্মাসনস্থ শ্রীমূর্ত্তি উত্তোলন (সপ্তদশ বৎসর)

১২৯৫ (মাঘ) ...... পাবনা হইতে কলিকাতায় গমন ও নিরুদ্দেশ

১২৯৭ (জ্যৈষ্ঠ) ...... জয়পুরের মহারাজ ভবনে প্রকাশ

১২৯৭ (আশ্বিন) ...... বৃন্দাবন হইতে ব্রাহ্মণকান্দা আগমন

১২৯৭ (অগ্রহায়ণ) ...... বুনাজাত্তির পরিবর্ত্তন ও বাকচর গমন

১২৯৮ (শ্রাবণ) ... .. হুগ্‌লীতে মিডিয়াম ও প্রভুর প্রথম প্রকাশ

১৩০০ (আষাঢ়) ...... ভক্তসঙ্গে পাবনা গমন

১৩০০ (আশ্বিন) ...... পাবনা হইতে নবদ্বীপে আগমন

১৩০১ (বৈশাখ) ...... প্রথম ঢাকা গমন

১৩০১ (আষাঢ়) ...... বাকচর শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা

১৩০৫ (আষাঢ়) ...... ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা

১৩০৭ (মাঘ) ...... কলিকাতায় প্লেগ মহামারী ও প্রভুর বিশেষ শক্তির প্রকাশ

১৩০৯ (আষাঢ়) ......প্রভুর মহামৌনাবলম্বন ও ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে কুটীরাবদ্ধ অবস্থা

১৩১৪ (বৈশাখ) ...... প্রভুর জন্মোৎসব আরম্ভ

১৩১৮ (আষাঢ়) ...... মহেন্দ্রজীর শ্রীঅঙ্গনে আগমন

১৩১৯ (অগ্রহায়ণ) ...... প্রভুর দ্বাদশ দিবস অনশন

১৩২০ (২৬শে মাঘ) ...... দ্বাদশ বৎসর পর প্রভুর কিছুক্ষণ বহিরঙ্গনে পদার্পণ

১৩২৫ (২৮শে মাঘ) ...... মৌনভঙ্গ ও নগরে ভ্রমণ

১৩২৮ (১লা আশ্বিন) ...... প্রভুর ত্রয়োদশ দশাশ্রয় গ্রহণ

১৩২৮ (২রা কার্ত্তিক) ...... শ্রীঅঙ্গনে অবিচ্ছিন্ন মহানাম-যজ্ঞ আরম্ভ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২০	নিত	নিত্য
৬	১৩	ভ্রাতৃস্পুত্র	ভ্রাতস্পুত্র
৮	৬	সান্তনাব	সান্ত্বনাব
৯	১৪	সস্কৃতভাষায	সংস্কৃতভাষায
১৪	১৯	শশ্মানে	শ্মশানে
২১	৪	১২৯৩	১২৯২
৩৪	২২	তিনি	প্রভু

৮১ পৃষ্ঠাব ২৩ পংক্তিব 'মুন্সীগঞ্জেব' শব্দটি উঠিযা যাইবে

৮২ ,, ২ ,, "সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী জজ" স্থলে "বাঙ্গালী জজদেব অন্যতম" হইবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	৭	নবদ্বীপে	বৃন্দাবনে
১০৭	১৫	এতৎ	এবং
১১১	১৪	দেখ্বি	দেখ্ বি
১১৫	২১	ব্রহ্মাধর্ম্মেব	ব্রাহ্মধর্ম্মেব
১১৭	২১	ষিধান	বিধান
১২৬	১৬	মধ্যে	মধ্যে মধ্যে
১২৭	৭	স্মবণে	স্মবণে
১২৭	১৯	'দিযাছিলেন' স্থলে 'আদেশ দিযাছিলেন' হইবে	
১২৯	১১	সংঙ্কটাপন্ন	সঙ্কটাপন্ন
১৩০	দ্বিতীয Subheading এ 'শ্বঐবিক' স্থলে 'ঐশ্ববিক' হইবে		
১৫৯	১৪ লাইনেব 'প্রভুব' শব্দটি উঠিযা যাইবে		
১৬০	৬	প্রভা	প্রভো

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহানাম সম্প্রদায়

(গ্রন্থ প্রচার বিভাগ)

প্রকাশক—

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত কার্য্যালয়

২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা

(প্রবেশ পথ—কানাইধর লেন, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট)

ফোন নং—বড় বাজার ১৯৭১

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রকাশের জন্য

আবেদন *

১। "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত"—দশ সহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী অভিনব গ্রন্থ। 'দৈনিক মাতৃভূমি', 'পঞ্চায়েৎ', 'আঙ্গিনা' 'সঞ্জয়' প্রভৃতি পত্রিকায় কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রাথমিক বিকাশ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইহা সুবিস্তৃত ইতিহাস স্বরূপ। সৃষ্টি যে আনন্দময় ব্রহ্মপুরুষের লীলা-নিকেতন, ইহার আবিলতা দূরীকরণের জন্য যে তিনি সদা সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব, যুগে যুগে যে তিনি দেশ, কাল ও পাত্র অনুরূপ লীলা-বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান জগতের ঘোরতর সংকট মুহূর্ত্তে নিখিল মানব জাতিকে সর্ব্বপ্রকারের অশান্তি, উপদ্রব ও তাপজ্বালা হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুনরায় যে তাঁহার মহাপ্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত—এই গ্রন্থে সেই সব বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে।

---

* এই আবেদন পত্রখানি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারে—"আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৪শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৪৭"—"যুগান্তর, ৩রা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৪৭" এবং "Hindusthan Standard, Monday, January 6, 1941" এই কয়েকটী খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থপাঠে বেদ, বেদান্ত, ভাগবত-পুরাণ, গোস্বামী শাস্ত্রসমূহ ও প্রভু জগদ্বন্ধু রচিত গ্রন্থাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিবেন। হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত বর্ত্তমান যুগে প্রেমধর্ম্মই যে মানবের একমাত্র আশ্রয়-স্থল, তাহা বোধগম্য হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের তিরোভাবের পর কিরূপে নানা উপধর্ম্মের উদ্ভবে, তাঁহার সুনির্ম্মল আদর্শ পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল, কিরূপে প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাতে আমরা আমাদের স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয় কৃষ্টির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম; অতঃপর দেশ ও জাতির ঐ শোচনীয় অবস্থার দিনে কিরূপে বিভিন্ন শ্রেণীর মহাপুরুষ বাংলা-ভারতের দিকে দিকে দিক্‌পালসম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন করিলেন, সেই সমস্ত কথা এই গ্রন্থে দূরদর্শীতার সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর গ্রন্থকার ব্রহ্মসূত্রের অভিনব ভাষ্যবাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্ত-বান্ধবগণের প্রতি কৃপার ধারার পরিচয় প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন। **'লীলামৃতের'** এই অংশ অপূর্ব্ব আস্বাদনের সামগ্রী হইয়াছে। এক কথায় এই মহাগ্রন্থ শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার অবতার রহস্য এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাকথায় পরিপূর্ণ।

২। **"শ্রীশ্রীবন্ধুলীলাগীতি"**—ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত 'সঞ্জয়' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন ছন্দে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ইহা অভিনব লীলাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে পদাবলী সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে।

৩। **"মহাআবির্ভাব রস-পীযূষ"**—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীজগদ্বন্ধু দেবের আবির্ভাব লীলা-তত্ত্ব বিভিন্ন শাস্ত্র যুক্তির উপর সুপ্রতি-ষ্ঠিত। সরল ও সরস পয়ার ছন্দে রচিত।

৪। **"মহাউদ্ধারণ মহাভাষ্য"**—(বেদান্ত দর্শন) ইহা এক অপূর্ব্ব আস্বাদনের সামগ্রী। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের প্রত্যেকটি সূত্র অবলম্বনে

এক বা একাধিক কবিতা রচিত। দার্শনিক জটিল তত্ত্ব কাব্যরসে সুরসিত।

৫। **"মহাভাগবত মহাপুরাণ"**—শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব ভাষ্য। ষোল অক্ষরাত্মক সরল পয়ার ছন্দে লিখিত। ১ম খণ্ড লেখা হইয়াছে।

৬। **"গৌর ভগবান"**—পঞ্চাঙ্ক নাটক। অভিনয়ের উপযোগী। দৃশ্যে দৃশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ ভগবত্তা প্রকটিত।

৭। **"মহাজাগরণী"**–(গীতিকাব্য) প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে মহাপ্রকাশের সাজে দেখিবার জন্য ভক্ত-কবির আকুল প্রার্থনা-গীতি।

৮—১১। **"পূজার অর্ঘ্য"—"তুলসীমঞ্জরী"—"আঙ্গিনার ধূলি"** ও **"গঙ্গাজল"**—এই চারিখানা কবিতার বই। প্রত্যেকটি কবিতাই অভিনব ভাবসম্পন্ন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি আজ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। কারণ গ্রন্থকার একজন নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী এবং তিনি যে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের অন্যতম সেবক, তাহাও কোন ঐশ্বর্য্যশালী প্রতিষ্ঠান বিশেষ নহে। অতএব সৎসাহিত্যানুরাগী, সহৃদয়, দানশীল, মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের সাহায্য পাইলে, এই সমুদয় অমূল্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন হইতে পারে।

বর্ত্তমানে কত সাধু-মহাত্মার জীবন কথা আলোচনা হইতেছে কিন্তু প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ন্যায় প্রকৃত অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত্ত বিগ্রহের সম্বন্ধে অনেকেরই বিশেষ কোন ধারণা নাই। সুদীর্ঘ একান্ন বৎসরকাল পর্য্যন্ত কিরূপে তিনি এই জগতে অবস্থান করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেকেরই আগ্রহ হওয়া উচিত। কারণ তাঁহার সুমধুর আদর্শ জীবনের যতই আলোচনা হয়, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল।

প্রভুর সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নানা ভ্রান্ত কথা প্রচাব হওয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাই তাঁহাব আদর্শ জীবনেব পূর্ণ বিবরণ সহ একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ ভবিষ্যৎ মানব সমাজেব জন্য সুরক্ষিত হওয়া একান্ত প্রযোজন। **ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস** প্রভুব সম-সাময়িক ভক্তবৃন্দেব নিকট হইতে বহু তথ্য অবগত হইয়া সুদীর্ঘকালের কঠোব সাধনাব ফলস্বরূপ উপরোক্ত "**শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত**" গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

দেশবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সুধীবর্গ ও পাঠাগাব সমূহেব কর্ত্তৃপক্ষগণেব নিকট আমবা সানুনয় প্রার্থনা কবি, তাঁহাবা যেন উক্ত গ্রন্থখানিব স্থায়ী গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া উহাব প্রকাশেব সহাযতা কবেন এবং গ্রন্থকাবের অন্যান্য গ্রন্থাবলীব মুদ্রণের জন্যও মুক্তহস্তে অর্থদান করিতে কুণ্ঠিত না হন।

বিনীত—

১। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি)
২। ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সবকাব (প্রফেসর, প্রেসিডেন্সি কলেজ)
৩। শ্রীকোকিলেশ্বব শাস্ত্রী (ভূতপূর্ব্ব প্রফেসব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
৪। শ্রীঅমূল্যধন বায় ভট্ট (প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পানিহাটী)
৫। শ্রীনদীয়াবিনোদ গোস্বামী (সভাপতি, গৌড়েশ্বর মণ্ডলী, শান্তিপুর)
৬। শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী (সেক্রেটারী, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা)
৭। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ভাবত সেবাশ্রম সংঘ)
৮। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, ভারতবর্ষ)
৯। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (সহঃসম্পাদক, ভারতবর্ষ)
১০। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন (সম্পাদক, দেশ)
১১। শ্রীপ্রভাপচন্দ্র গুহ রায় (ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, দৈনিক মাতৃভূমি)
১২। শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ (সম্পাদক, নবদ্বীপ পত্রিকা)

১৩। শ্রীমুরারিমোহন গোস্বামী (সেবাইত ও সম্পাদক, নবদ্বীপ হরিসভা)
১৪। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী (সভাপতি, ফরিদপুর সেবাসমিতি)
১৫। ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র (ভূতপূর্ব্ব সভাপতি......ঐ)
১৬। শ্রীভুবনমোহন সেন (বার, এট, ল, কলিকাতা হাইকোর্ট)
১৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদক, সঞ্জয়, ফরিদপুর)
১৮। ডাঃ শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, সুচিকিৎসা) প্রভৃতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অর্থাদি পাঠাইবার ঠিকানা :—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ,
সম্পাদক, 'ভারতবর্ষ'—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত

গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য বিষয়

১। এই গ্রন্থ প্রতিখণ্ড রয়েল সাইজের ১২ হইতে ১৬ ফর্ম্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া অন্যূন ত্রিশখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ তিনটি খণ্ড প্রকাশ করা যাইবে।

২। প্রতিখণ্ডের মূল্য স্থায়ী গ্রাহক পক্ষে ১৲ এবং সাধারণ ১।০ হারে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

৩। স্থায়ী গ্রাহকগণকে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ বিশেষ কম মূল্যে এবং "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলাগীতি" নামক অপূর্ব্ব লীলাগ্রন্থখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

৪। লীলামৃতের খণ্ড প্রকাশিত হইলে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জানাইয়া গ্রাহকদের নামে ভিঃ পিঃ করা হইবে।

৫। হাতে বা লোকমারফৎ লইতে হইলে দুই উক্ত সপ্তাহের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করিতে হইবে কিন্তু ভিঃ পিঃতে গ্রন্থ প্রেরণই সাধারণ নিয়ম থাকিবে।

৬। যাঁহারা স্থায়ী গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে শেষখণ্ডের মূল্য বাবদ অগ্রিম একটাকা জমা দিতে হইবে।

৭। কোন কারণে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে উক্ত জমার টাকা হইতে মাশুল কাটা যাইবে এবং পত্র লিখিলে পুনরায় ভিঃ পিঃ করা হইবে।

৮। গ্রাহকগণ নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক – "লীলামৃত কার্য্যালয়ে" জানাইয়া রাখিবেন।

৯। স্থায়ী গ্রাহকগণকে **"প্রভু জগদ্বন্ধু"** নামক সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থখানি প্রথম দেওয়া হইবে।

১০। ম্যানেজার—**শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত, কার্য্যালয়—২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা**—এই ঠিকানায় উপরোক্ত নিয়মাবলী মানিয়া লইয়া পত্র দিলেই নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়া প্রথম দেয় **'প্রভু জগদ্বন্ধু'** গ্রন্থখানি ভিঃ পিঃ তে প্রেরিত হইবে।

১১। উক্ত **"লীলামৃত কার্য্যালয়"** (প্রবেশ পথ ২৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কানাইধর লেন) এবং কলিকাতার প্রধান পুস্তকালয়সমূহ হইতেও অর্ডার দিয়া কিংবা হাতে গ্রন্থ লওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি-লীলামৃত প্রকাশের জন্য শিলং গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, সাক্ষাৎ প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত, মহাভাগবতোত্তম **শ্রীশ্রীপাদ জয়নিতাই** (দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ) **দেবের—**

নিবেদন

ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ পরিমলবন্ধু দাস অভিন্ন নিতাই-গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু সুন্দরের মহালীলাভূমি শ্রীশ্রীধাম ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের অন্যতম

ব্রহ্মচারী সেবক। বহুদিন যাবৎ শ্রীমান্ বিভিন্ন ভক্ত-বান্ধবদের নিকট হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলাকথা সংগ্রহের কার্য্যে ব্রতী আছেন।

আজ আমি দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম যে শ্রীমান বিশুদ্ধ ভাগবতীয় ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণ দশসহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীমানের কৃপাসিক্ত লেখনীর ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাউদ্ধারণ লীলার এই মহাপ্রকাশ দেখিয়া আমি পরমাশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।

শ্রীশ্রীব্রজলীলা, শ্রীশ্রীগৌরলীলা এবং শ্রীশ্রীমহাউদ্ধারণ লীলার অনুরক্ত ভক্ত-বৈষ্ণব-বান্ধব-সজ্জনগণের নিকট আমি নিবেদন করি, তাঁহারা "**শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত**' নামীয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ স্ব স্ব গৃহে যাহাতে সযত্নে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য এই মহাগ্রন্থের স্থায়ী গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীমানকে আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ পরমদয়াল ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রেমময় প্রভুর শ্রীশ্রীপাদপদ্মে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের সাফল্য কামনা করিতেছি। ইতি—

জয় জয় পরম দয়াল নিতাই-গৌর-বন্ধু-দাস,

(স্বাঃ) জয় নিতাই (দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী)

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীমৎ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী (এম, এ, পি, এইচ, ডি,)র **অভিমত :—**

এই 'লীলামৃত" গ্রন্থের "সঞ্চয়ে" প্রকাশিত "মহাআবির্ভাবের অরুণাভাস বা লৌকিক বংশ পরিচয়ের" কতকাংশ শ্রীমৎ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীর নিকট আমেরিকাতে প্রেরিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া তিনি গ্রন্থকারের নামে "চিকাগো, ৬১৩৭ উড্‌লন, এভেনিউ' হইতে ১৯৩৭

খৃঃ অব্দের ২৮শে নভেম্বর যে চিঠিখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল। এতদ্‌ব্যতীত আমেরিকা হইতে গ্রন্থকারের নামে উক্ত ব্রহ্মচারী মহারাজ এই গ্রন্থের অপরাপর প্রবন্ধ সম্বন্ধেও অতি উচ্চ প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন।

"পত্রাংশ"

প্রাণের ভাই পরিমলবন্ধু!

তোমার প্রেরিত "সঞ্জয়" পত্রিকার কয়েক সংখ্যা যাহাতে তোমার লেখনীপ্রসূতঃ বন্ধুলীলা কথা-গাথা বাহির হইয়াছে, তাহা পাইলাম। তোমার লিখিত 'শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত' (মহাআবির্ভাবের অরুণাভাস) একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলাম! যত পড়ি, ততই মধুর—তোমার লেখনী অমৃতবর্ষী, ভাব-ভাষা বর্ণনার পরিপাটী সকলই চিত্ত চমৎকার-কারী। একে তো পুণ্যবংশ, তাহাতে তোমার কৃপাসিক্ত লেখনী—মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

এই যে ভাবে লিখিতেছ—সেইভাবে শ্রীশ্রীপ্রভুর বাল্য, কৈশোর, মহাগম্ভীরা লীলা, শ্রীশ্রীমহানাম যজ্ঞ, প্রচারণ ও বর্ত্তমান লীলাখেলা পর্য্যন্ত যদি ফুটাইয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে জগতে এক অক্ষয়, অমৃতময় বস্তু রাখিয়া যাইবে। তোমার দ্বারা প্রভু ইহা করাইবেন, ইহা আমার প্রাণের আশা।

তোমার লেখা সম্বন্ধে একটীমাত্র বক্তব্য এই যে, ঐ সব কথা তুমি কোথা হইতে পাইয়াছ—মাঝে মাঝে তাহার ইঙ্গিত থাকা প্রয়োজন। পাছে লোকে ইহাকে নাটক-নভেল বা মনগড়া খোসগল্প মনে না করে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের অনৈসর্গিক লীলাখেলা বর্ত্তমান জগতের ইতিহাস তত্ত্ববিদ্ অভিমানিগণের নিকট অধিকাংশই গল্প মাত্র। এ দেশেও দেখিতে পাই, বাইবেল-বর্ণিত যীশুখৃষ্টের জীবনের অনেক ঘটনা তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ অপ্রকৃত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলাখেলার অনেক কথাও এখন লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তুমি কবি, তাই বলিয়া কাব্য ও ইতিহাসের ভেদ তোমার কাছে কিছু অজানা নয়। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় কাব্য কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবত ইতিহাস। তুমি যখন বন্ধুলীলা কাব্য লিখিবে, তখন তাহাকে কাব্যই করিও কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে যথাসাধ্যভাবে ইতিহাস করিও, ইহাই আমার আশা ও প্রার্থনা। যাহা লিখিলাম, ইহা হইতে যেন মনে করিও না, যে রমেশ দত্তের ভারতের ইতিহাসের ধাচে শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলাকথা লিখিতে হইবে, এইরূপ কিছু বলিতেছি।

তুমি যে ধারায় লিখিতেছ, ইহাই সুষ্ঠু, সুললিত ও শ্রবণমঙ্গল। সাজ-সজ্জা, আভরণ-অলঙ্কার যত পার পরাইবে, তবে তুমি যে জীবন্ত মানবকে সাজাইতেছ, কোন কল্পনার ছবিকে নহে—ইহাই নানাভাবে পাঠকের প্রাণে অনুভব করাইয়া দিবে। সন্দেহবাদী অথচ সত্যলোলুপ ইতিহাসজ্ঞের উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে। তাহাদের কথায় বেশী কান দিবে না।

তবে দু'শ, পাঁচশ, হাজার বৎসর পরে তাহাদের মত অনেক লোক তোমার এই লেখাকেও পড়িবে ও বিশ্লেষণ করিবে। ইহা একেবারে ভুলিয়া যাইবে না।

অনেক বলিলাম ; ক্ষমা করিও। উপসংহারে আবারও বলি, 'লীলামৃত' যেটুকু 'সঞ্জয়' হইতে পড়িয়াছি, তাহা নিরুপম।

তোমার স্নেহের—

'মহানাম দা'।

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস সংকলিত

শ্রীশ্রীবন্ধুবেদবাণী । (পকেট সংস্করণ) মূল্য চারিআনা মাত্র ।

(প্রভু জগদ্বন্ধুর সুমধুর উপদেশাবলী)

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকখানি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকার অভিমত উদ্ধৃত হইল।

"দৈনিক আনন্দবাজার" বলেন, "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু কৃত বাণী সমূহ তাঁহার প্রাচীন ভক্তগণের সংগ্রহ হইতে এই পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। অধ্যাত্মরসপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই এই সংকলন হইতে সাধন রাজ্যের আলোক পাইবেন। বৈষ্ণব সাধনতন্ত্রের বিশিষ্ট রস যাঁহারা উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা তো এই সংগ্রহ পর্য্যালোচনায় আনন্দ লাভ করিবেনই, তাহা ছাড়া আর সকলেও ইহাতে অনেক ভাবিবার এবং বুঝিবার জিনিস পাইবেন।"

(আনন্দবাজার, রবিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৪৭।)

সুবিখ্যাত **"সাপ্তাহিক দেশ"** বলেন শ্রীশ্রীবন্ধুবেদবাণীর সংকলয়িতা ব্রহ্মচারী শ্রীপরিমলবন্ধু দাস সুলেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি একজন সাধক এবং পরম ভক্ত। ভক্তিধর্ম্মের অবতার প্রভু জগদ্বন্ধুর মধুর উপদেশাবলী চয়ন করিয়া তিনি এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন। এগুলি পাঠ করিলে চিত্ত পবিত্র এবং উন্নত হয়, মননে মনে শান্তি পাওয়া যায়। অধ্যাত্মরস পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। এমন পুস্তকের যত প্রচার হয়, ততই ভাল।" (দেশ, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৭ সাল)

দৈনিক পত্রিকা "যুগান্তর" বলেন, "পরম বৈষ্ণব সংকলয়িতা মহোদয়, এই গ্রন্থে প্রভু জগদ্বন্ধুর কতকগুলি উপদেশ একত্র করিয়াছেন।

* * * * *

এইরূপ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হওয়া উচিত। আমরা এরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।" (যুগান্তর, ২৭শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪৭)

দৈনিক ইং পত্রিকা "অমৃতবাজার" বলেন, 'This small book is a collection of the Aphoristic sayings of Jagadbandhu Hari. The booklet also contains short discourses on religio-ethical Subjects, It will bring, we are sure, peace to the reader's mind. (Amrita bazar, Sunday March 3, 1940)

সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' বলেন, "শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুব বাণী সমূহকে সংকলন ক'বে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "একান্ত ভাবময় যাঁরা, তাঁদেব বাণীর বহুল প্রচার আমাদের বস্তুতান্ত্রিক মনকে একটা বিশুদ্ধতব আবহাওয়ায় পৌঁছে দেবে"— এই বিশ্বাসে নির্ভর কবেই মহানাম সম্প্রদায় গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন। বইখানি ধর্ম্মজ্ঞদেব প্রযোজনে লাগ্‌বে।" (বাতায়ন, শুক্রবার. ২৩শে চৈত্র, ১৩৪৬)

ফরিদপুরের সুপ্রাচীন সাপ্তাহিক "সঞ্জয়" বলেন. "প্রেমাবতার প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের সুমধুব উপদেশ-বাণীতে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ।***বর্ত্তমান জগতের ধ্বংস প্রলয়ঙ্কর সংকট মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচাবীজি জগদ্বন্ধু দেবের বাণী প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত। ফরিদপুব যাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত, ফরিদপুরের যিনি অধিষ্ঠাতা দেবতা, আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কথাগাথা সম্যক্‌ প্রচারিত হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ প্রভু জগদ্বন্ধুর আদর্শ অন্যান্য আচার্য্যদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রভুর বাণী কবিত্বময়, ভাবময়। পরন্তু কেবল ধর্ম্মোপদেশই সংকলিত এই গ্রন্থ নহে, সামাজিক, ধার্ম্মিক, এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সমস্যা সমাধানেরই উপায়, ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। প্রেমধর্ম্ম ও ভক্তিবাদের মর্ম্মকথায় ইহা পরিপূর্ণ। কামকামনাসঙ্কুল উন্মার্গগামী মানব এই 'বন্ধুবেদবাণী' পাঠে প্রেম-পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমরা

আশা করি, সত্যানুসন্ধিৎসু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট এই গ্রন্থ সবিশেষ আদৃত হইবে।" (সঞ্জয়, ২০শে পৌষ, ১৩৪৬ সাল)

দৈনিক "ভারত" বলেন, "প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের উপদেশাবলীর সার এই পুস্তকখানিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রভুর কোন জীবনী ও বাণী আজ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রচার হয় নাই। কারণ, লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন। প্রভুর আদেশ-উপদেশাবলীতেই 'বন্ধু বেদবাণী' পরিপূর্ণ। ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকগণ ইহা পাঠে তৃপ্তি লাভ করিবেন।" (ভারত, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪৭ সাল)

সাহায্য প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নোক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্যে "প্রভু জগদ্বন্ধু" গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় (উদয়নারায়নপুর, হাওড়া) ২০৲

২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র (জমিদার, শীতলাইর, পাবনা) ১০৲

৩। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (২০ সাউথ এণ্ড পার্ক, কলিকাতা) ১০৲

৪। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী (বরাহনগর, পাটবাড়ী) ১০৲

৫। শ্রীযুক্তা সুখসোনা দাসী (পোস্তার রাণী, কলিকাতা) ১০৲

৬। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (৪০নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ৬৲

৭। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রুদ্র পাল (টিচার, অরুণ হাইস্কুল, নোয়াখালি) ৫৲

৮। রায় শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর (জমিদার, তারাস, পাবনা) ৫৲

৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেন (৯০নং চৌরঙ্গী রোড, কলিঃ) ৫৲

১০। স্যার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (৮ হাঙ্গরী ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ৫৲

১১। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় (তেওতা, ঢাকা) ২৲

১২। সুচিকিৎসা প্রেস (২৪।১ বেনিয়টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ৫৲

১৩। শ্রীকানাই লাল দাস (প্রোঃ দাস ব্রাদার্স, ১০নং গরানহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ব্লক তিনখানা।

১৪। শ্রীমৎ প্রেমদাস ব্রহ্মচারী (মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা) ব্লক ১খানা।

১৫। মোহন প্রেস (২ কোরিস চার্চ্চ লেন, কলিকাতা) ব্লক মুদ্রণ ৩ খানা

দুটী প্রাণের কথা

সংস্কৃতে একটী বাক্য আছে, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—বাংলায় বলে, সৎকাজে নানা বাধা। দীর্ঘকাল হইতে কথাটি শ্রুতি গোচরে ছিল, কিন্তু গত ১৩৪৬ সালের আষাঢ় মাসে মহাউদ্ধারণ প্রভুর বাণী ও জীবনী প্রচারের কার্য্যে ব্রতী হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে লাগিলাম। একমাত্র প্রভুর শুভেচ্ছা শক্তি পশ্চাতে কার্য্যকরী থাকাতেই সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "শ্রীশ্রীবন্ধুবেদবাণী" প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার "প্রভু জগদ্বন্ধু" গ্রন্থ মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াও পদে পদে তাঁহার কৃপার অনুভব পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সংকল্পের দৃঢ়তা, নিঃস্বার্থ-পরতা, সর্ব্বোপরি নির্ভরতা থাকিলে যাঁর কার্য্য তিনিই করাইয়া লন, একথা সত্য কিন্তু আমার ন্যায় নানা দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন ও ভক্তি-বিশ্বাসশূন্য মূঢ়

জীব-কীটের দ্বারা তাঁহার মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলীর প্রকাশ ও প্রচারের কার্য্য হইতে পারে, ইহা ভাবিতেও পারি না। তথাপি তিনি সেই কার্য্যেই ব্রতী করিয়াছেন। জানি না, আরব্ধ কার্য্যের পরিণাম কিরূপ হইবে। তবে যিনি ইচ্ছা করিলে পঙ্গুর দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারেন, পিপীলিকার দ্বারাও যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ধারের শক্তি ধরেন—তাঁহার কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। আমার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি হীন, ত্রিতাপজর্জ্জরিত জীবাধমের দ্বারা তাঁহার কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হয় হউক্—এইরূপ ভাবানুপ্রেরণার বলেই এত বড় বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু যে সমস্ত ভক্ত, বৈষ্ণব, বান্ধব ও সুধীবর্গ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাকথামৃত আস্বাদনের জন্য আগ্রহান্বিত আছেন এবং যাঁহারা স্কুল, কলেজ ও সাধারণ লাইব্রেরী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

"কাষ্ঠের পুত্তলী যৈছে কুহকে নাচায়"—তেমিভাবে একমাত্র প্রভুর প্রেরণাবলেই উক্ত "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত" গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন আপনি ইহার প্রকাশের কার্য্যে সহায়ক হইলে উক্ত গ্রন্থখানির প্রকাশ সহজসাধ্য হইতে পারে। আপনি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। প্রথমতঃ এককালীন দান, দ্বিতীয়তঃ স্থায়ী গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া, তৃতীয়তঃ আপনার বন্ধু বান্ধবদিগকে স্থায়ী গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা। আপনার যে কোন প্রকার সাহায্যেরই ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে।

আমি আপনাদেরই একজন নগণ্য সেবক মাত্র। আরব্ধ কার্য্যে আমার ব্যক্তিগত কোনই স্বার্থবুদ্ধি নাই আপনি লীলামৃতের গ্রাহক হইলে প্রকারান্তরে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে প্রভুর সেবারই সাহায্য করা হইবে। এই গ্রন্থ ও অপরাপর মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলীর প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা যদি দেশ ও জাতির কথঞ্চিৎ কল্যাণ হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান

করিব। আশা করি, আপনি সাধ্যানুযায়ী সাহায্য, সহানুভূতি ও উৎসাহ আশীর্ব্বাদ দান করিতে ভুলিবেন না।

পরিশেষে যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ও মহামান্য ব্যক্তি মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী প্রচারে দেশবাসীর নিকট আবেদন প্রচাব কবিযাছেন এবং যে সমস্ত সংবাদপত্রসেবী এবং সাহিত্যিক বান্ধব বিশিষ্ট পত্রিকাগুলিতে উক্ত আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়া প্রচাবেব সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই কৃতাঞ্জলিপুটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। জগতের বর্ত্তমান সংকট মুহূর্ত্তে প্রভু জগদ্বন্ধুব বাণী ও জীবনী প্রচাবের প্রয়োজনীয়তা যে তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন, ইহা পরম আশার কথা সন্দেহ নাই। পরিশেষে শ্রীশ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে কায়-মনে প্রার্থনা জানাই, অচিরেই তিনি স্বকীয় মহাপ্রকাশের দ্বারা জীব-জগতের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দুর্গতি মোচন করুন ; ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের—মহাধর্ম্ম পীঠ হইতে অবিরত যে মহানাম-প্রেমপীযুষ-ধারা ঝরিতেছে—ধ্বংসোন্মুখ মানব সভ্যতা তাহাতে নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক্! জয় জগদ্বন্ধু। জয় মহানাম যজ্ঞ।

বান্ধব-বৈষ্ণব-কৃপাভিখারী

ব্রহ্মচারী শ্রীপরিমল বন্ধু দাস